পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-২

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম শ্রেণি





জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং -২
Poultry Rearing and Farming -2

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড : ৪৮০১২

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

কৃষিবিদ মো: মুনজুর হোসেন

কৃষিবিদ মো: শাহজাহান কবির

কৃষিবিদ পবন কুমার সরকার

মুহাম্মদ কামরুল হাসান ভূঞা

মির্জা মোহাম্মদ তৌহিদুল করিম

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০২১

পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০২৩

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৪

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

আধুনিককালে শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নতির প্রত্যাশা করা যায় না। পৃথিবীর যেসব দেশ আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাদের দিকে তাকালেই এ সত্যটি অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশের মতো অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশে কারিগরি শিক্ষার আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের সহায়ক এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায়। কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে আর্থসামাজিক উন্নতির নজির গড়েছে বিশ্বের অনেক দেশ। এশিয়ার চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ এর উজ্জ্বল প্রমাণ। জাতীয় উন্নতির স্বার্থে বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তারে সরকার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। কারিগরি শিক্ষার জন্যে পৃথক অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই শিক্ষার জন্যে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল স্তরে কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষার অধিকতর সম্প্রসারণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতাকে বিবেচনায় নিয়ে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন ট্রেডের বইগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের কর্মবাজারের চাহিদাকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কারণ বিশ্বায়নের এই যুগে গোটা বিশ্ব এখন অখণ্ড এক কর্মবাজার। বর্তমানে দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকলে যেকোনো দেশের মানুষ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে পারে। বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ তার হিস্যা যত বাড়াবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত গতিশীল হবে। বাংলাদেশের বিশেষায়িত অনেক শিল্পে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিল্পখাতে দক্ষ জনবল সরবরাহের লক্ষ্যকেও বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

সরকারের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের আওতা থেকে কারিগরি শিক্ষার বই বাইরে নয়। ভোকেশনাল ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৭ সাল থেকে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো সংশোধন, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-কে। এনসিটিবি নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ২০২৪ সাল পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন ও সংশোধন সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বইগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি বই উন্নত মানের কাগজ ও চার রঙা প্রচ্ছদ সহকারে ছাপা হয়েছে। এতে বইগুলোর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ। পূর্ব ও পরবর্তী শ্রেণির পঠিত বিষয়সমূহের সাথে যৌক্তিক সংযোগ বিধানপূর্বক বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ট্রেডের এই বইটি প্রায়োগিক শিক্ষার জন্যে যাতে অনুকূল হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় চিত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে। বইটি যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বকর্মসংস্থান ও সম্মানজনক জীবিকার্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সাবলীল ভাষায় লেখা বইটিতে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-২

প্রথম অধ্যায়

হাঁস পালন পদ্ধতি

Duck Rearing Method



বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশে প্রচুর পরিমানে হাওর-বাওড়, নদী-নালা, বিল-ঝিল, পুকুর-জলাশয় রয়েছে। প্রচুর প্রাকৃতিক পানির উৎস থাকায় এদেশে হাঁস পালন করা অধিক সুবিধাজনক। এছাড়াও বাংলাদেশের জলবায়ু ও পরিবেশ হাঁস চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এ দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষাকালে বাংলাদেশের প্রায় তিন চতুর্থাংশ জলমগ্ন হয়ে থাকে। এ সময় খাল-বিলে আটকা পানিতে মানুষের খাদ্য নয় এমন অনেক জলজ প্রাণী (শামুক, ঝিনুক) ও উদ্ভিদ (শৈবাল) জন্মে থাকে। এ সমস্ত জলজ প্রাণী হাঁসের অতি প্রিয় উপাদেয় খাদ্য। আবহমান কাল থেকে এ দেশের গ্রাম গঞ্জে সনাতন পদ্ধতিতে হাঁস পালন প্রচলিত আছে। বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে বেশ কিছু হাঁসের লাভজনক খামার গড়ে উঠেছে যেখান থেকে ডিম ও মাংসের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ হচ্ছে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- হাঁস পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি বলতে পারবো।
- হাঁসের বাচ্চার ব্রুডার ঘর সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে পারবো।
- ব্রুডার ঘরে যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও হাঁসের বাচ্চা সঠিকভাবে প্রতিস্থাপন করতে পারবো।
- ব্রুডার ঘরে সঠিকভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও আনুষঙ্গিক কাজ করতে পারবো।
- হাঁসের ব্রুডিং দক্ষতা অর্জন করতে পারবো।
- হাঁসের ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতে পারবো।
- বাসস্থানের জীব নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারবো।

১.১ হাঁস পালন পদ্ধতি

নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ও অজস্র পুকুর আর জলাশয়ে সমৃদ্ধ আমাদের এ বাংলাদেশ। দেশের ভৌগলিক অবস্থা বিবেচনায় নিম্নাঞ্চলে অর্থাৎ যেখানে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় আছে সে সব এলাকার মানুষ কম পুঁজিতে হাঁস পালন করে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আজকাল আমাদের দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য হাঁস পালন জীবিকার অন্যতম উপায়। আমাদের দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তেমনভাবে হাঁসের খামার গড়ে না উঠলেও গ্রামের কৃষকেরা প্রচলিত পদ্ধতিতে হাঁস পালন করে থাকেন।

সাধারনত হাঁস পালনে নিম্নের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যথা:

ক) উন্মুক্ত পদ্ধতি (Open Method)
খ) অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি (Semi-intensive Method)
গ) আবদ্ধ পদ্ধতি (Intensive Method)
ঘ) হার্ডিং পদ্ধতি (Herding Method)
ঙ) লেন্টিং পদ্ধতি (Lenting Method)

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- হাঁস পালনের জন্য বাংলাদেশ উপযুক্ত কেন?
- হাঁস পালনের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখো।

ক) উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস পালন

এটি হাঁস পালনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে এ পদ্ধতিতে হাঁস পালন করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে দিনের বেলা হাঁসগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে খায়। সন্ধ্যা বেলায় যখন হাঁসগুলো ঘরে ফিরবে তখন প্রতিদিন কিছু তৈরি সুষম খাবার সরবরাহ করতে হবে। সন্ধ্যা বেলায় কিছু খাবার সরবরাহ করার নিয়ম চালু রাখলে খাবার ও আরামদায়ক বাসস্থানের লোভে এরা ঘরে ফিরে আসবে। রাতে বাড়িতে নির্দিষ্ট জায়গায় আবদ্ধ করে রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে হাঁসকে অতিরিক্ত তেমন খাবার দেয়া হয় না বললেই চলে।

এ পদ্ধতিতে বাড়ন্ত ও পূর্ণবয়স্ক হাঁস পালন করা সুবিধাজনক। যেসব অঞ্চলে পতিত জলাশয় রয়েছে এবং খালবিল বেশি সেখানে এ পদ্ধতিতে হাঁস পালন সবচেয়ে ভালো। ডিমপাড়া হাঁসগুলোকে সকাল ৯.০০ টা পর্যন্ত ঘরে আবদ্ধ করে রাখতে হয় কারণ হাঁস সকাল বেলায় ডিম পাড়তে পছন্দ করে।



চিত্র: ১.১ উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস পালন

উন্মুক্ত পদ্ধতির সুবিধাসমূহ-

- এ পদ্ধতিতে হাঁস পালনে খাদ্য খরচ কম হয়।
- বাসস্থানের জন্য খরচ কম হয়।
- ব্যবস্থাপনায় কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।
- মুক্ত আলো বাতাসে চলাচল করতে পারে বিধায় আবদ্ধ পদ্ধতির তুলনায় এ পদ্ধতিতে হাঁসের বৃদ্ধি ভালো হয়।

উন্মুক্ত পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ-

- হাঁসগুলোকে বিভিন্ন শিকারী প্রাণি খেয়ে ফেলতে পারে।
- খারাপ আবহাওয়ায় হাঁসের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।
- সব সময় পর্যবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- মুক্ত জায়গায় ডিম পাড়লে ডিমের সংখ্যা কম হতে পারে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ।

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধাসমূহ	উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধাসমূহ
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

২০২৫

খ) অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালন

এই পদ্ধতিতে হাঁসগুলো রাতের বেলায় ঘরে আবদ্ধ থাকে এবং দিনের বেলায় ঘর সংলগ্ন একটি নির্দিষ্ট ফাঁকা জায়গার মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়। এটি তারের জাল দ্বারা ঘেরা থাকে। এ নির্দিষ্ট গন্ডিকে রেঞ্জ বা রান বলে। এ গন্ডির ভেতরে প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রায় ১০ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়। এ পদ্ধতি বাড়ন্ত ও প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসের জন্য উপযোগী। রেঞ্জ বা গন্ডির ভেতরে সিমেন্ট দিয়ে বড় ধরনের পানির পাত্র তৈরি করা হয়। এখানে হাঁসগুলো সাঁতার কাটতে পারে এবং খাবার পানি খেতে পারে। প্রতিটি হাঁসকে দৈনিক ১৪০-১৬০ গ্রাম খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।



চিত্র: ১.২ অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালন

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ-

- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস পালন করা সুবিধাজনক।
- হাঁসের যত্ন নেওয়া সহজ।
- খাদ্য গ্রহণ সমভাবে হয়।
- শিকারী প্রাণির কোনো ভয় থাকে না।
- স্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রদান করা যায়।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ-

- বেশি পরিমাণ খাবার সরবরাহ করতে হয়।
- যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ খরচ বেশি হয়।
- মুক্তভাবে চলাচলের সীমাবদ্ধতা থাকে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধাসমূহ	অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধাসমূহ
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

গ) আবদ্ধ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে হাঁসগুলোকে সবসময় আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। বাচ্চা হাঁস (৪-৬ সপ্তাহ) পালনের জন্য এই পদ্ধতি খুবই উপযোগী। আবদ্ধ পদ্ধতি তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

i. মেঝে পদ্ধতি

ii. খাঁচা পদ্ধতি বা ব্যাটারি পদ্ধতি

iii. তারজালির মেঝে পদ্ধতি

i. মেঝে পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চাগুলো আবদ্ধ অবস্থায় মেঝেতে পালন করা হয়। এ ধরনের মেঝেতে লিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খাবার এবং পানি দিয়ে লিটার যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য ঘরের এককোণে তারজালের উপর পানি পাত্র ও খাদ্য পাত্র রাখা হয়।



চিত্র: ১.৩ মেঝেতে হাঁস পালন

মেঝেতে হাঁস পালনের সুবিধাসমূহ-

- হাঁসগুলোকে ভালোভাবে পরিচর্যা করা যায়।
- এই পদ্ধতিতে খরচ কম লাগে।
- এই পদ্ধতিতে শ্রমিক কম লাগে ।

মেঝেতে হাঁস পালনের অসুবিধাসমূহ-

- ঘরের লিটার ঘন ঘন পরিবর্তন করতে হয়।
- বাসস্থান সহজেই স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায় তাই বাসস্থান সহজেই কলুষিত হয়।

ii. খাঁচা বা ব্যাটারি পদ্ধতি

খাঁচা পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চাগুলো আবদ্ধ অবস্থায় খাঁচায় পালন করা হয়। এ ধরনের খাঁচায় খাদ্য ও পানি দেয়ার আলাদা ব্যবস্থা থাকে। খাবার এবং পানি দিয়ে লিটার যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য ঘরের এককোণে তারজালের উপর পানি পাত্র ও খাদ্য পাত্র রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চাগুলোকে খাঁচায় পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০.৭৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়। বাচ্চা পালনের জন্য এ পদ্ধতি খুবই সুবিধাজনক।



চিত্র: ১.৪ খাঁচা বা ব্যাটারি পদ্ধতিতে হাঁস পালন

খাঁচায় হাঁস পালনের সুবিধাসমূহ-

- এই পদ্ধতিতে বাচ্চা হাঁস পালন করা সহজ।
- অনেকগুলো বাচ্চা একসাথে পালন করা যায়।
- সহজে বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করা যায়।

খাঁচায় হাঁস পালনের অসুবিধাসমূহ-

- এই পদ্ধতিতে বড় হাঁস পালন করা যায় না।
- এই পদ্ধতির প্রাথমিক খরচ বেশী হয়।

iii. তারের জালের মেঝেতে হাঁস পালন

এক্ষেত্রে হাঁসের বাচ্চাগুলোকে তারের জাল দিয়ে নির্মিত মেঝেতে পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০.৫-০.৭৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়। এ পদ্ধতিতে ঘরের মেঝে থেকে উঁচু করে তারের জাল দেয়া হয় এবং তারের জালের ফাঁক যাতে ১.৫ বর্গ ইঞ্চির বেশি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মাচার চারপাশে ১-২ ফুট উঁচু করে বেড়া দিতে হবে যেন হাঁসের বাচ্চা বাইরে পড়ে না যায়। এই পদ্ধতিতে হাঁস পালন করলে প্রাথমিক খরচ একটু বেশি হয়।



চিত্রঃ ১.৫ তারজালির মেঝে পদ্ধতিতে হাঁস পালন

তারের জালের মেঝেতে হাঁস পালনের সুবিধাসমূহ-

- বাচ্চা হাঁস পালনের জন্য এ পদ্ধতি সুবিধাজনক।
- হাঁসের ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সুবিধা হয়।
- খাদ্য ও পানি সরবরাহের সুবিধা হয়।

তারের জালের মেঝেতে হাঁস পালনের অসুবিধাসমূহ-

- তারের জাল বাবদ খরচ বেশি হয়।
- সাধারণত বেশি বয়স্ক হাঁস পালন করা যায় না।

১২০৫

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ।

আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধাসমূহ	আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধাসমূহ
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

ঘ) লেন্টিং পদ্ধতি

যে সব এলাকায় বড় বড় হাওড়-বাওড়, বিল-ঝিল থাকে সে সব এলাকায় এই পদ্ধতিতে হাঁস পালন করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে হাওড়, বিলে ভাসমান ঘর তৈরি করে হাঁস পালন করা হয়। প্রতিটি ফ্লকে বা দলে ১০০-২০০ টি হাঁস পালন করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে হাঁস মুক্ত জলাশয় থেকে নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে খেয়ে থাকে। তবে অল্প পরিমাণ অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে হাঁসের ডিম উৎপাদন ভালো হয়। হাঁসগুলো সঠিক সংখ্যায় ও সময়মত ফিরছে কিনা সে দিকে লক্ষ্য করার জন্য একজন পাহারাদার প্রয়োজন হয়।



চিত্র: ১.৬ লেন্টিং পদ্ধতিতে হাঁস পালন

লেন্টিং পদ্ধতির সুবিধাসমূহ-

- এই পদ্ধতিতে হাঁসের ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- খাবার খরচ কম লাগে।
- বাসস্থান নির্মাণ বাবদ খরচ কম হয়।

লেন্টিং পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ-

- এই পদ্ধতিতে বাচ্চা হাঁস পালন করা যায় না।
- কিছু অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।
- হাঁস হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

লেন্টিং পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ।

লেন্টিং পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধাসমূহ	লেন্টিং পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধাসমূহ
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

ঙ) হার্ডিং পদ্ধতি

বাড়ন্ত এবং পূর্ণ বয়স্ক হাঁস পালনের জন্য এ পদ্ধতি বেশ ভালো। এ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের জন্য কোনো রকম ঘরের প্রয়োজন হয় না। হাঁসগুলোকে সবসময় গতিশীল রাখা হয় অর্থাৎ যে সমস্ত জলাশয়ে খাদ্য আছে হাঁসগুলোকে পর্যায়ক্রমে সে সমস্ত জলাশয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সারা দিন খাদ্য খাওয়ার পরে রাতের বেলা হাঁসগুলোকে কোনো একটি উঁচু জায়গায় সকাল ৯টা পর্যন্ত আটকিয়ে রাখা হয় কারণ হাঁসগুলো সকাল বেলায় ডিম পাড়ে। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কিছু দিন প্রাকৃতিক খাদ্য খাওয়ানোর পর অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে একজন লোক ১০০-৫০০ টি হাঁস রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে।



চিত্র: ১.৭ হার্ডিং পদ্ধতিতে হাঁস পালন

হার্ডিং পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধাসমূহ-

- খাদ্য খরচ নেই।
- ঘর নির্মাণের প্রয়োজন হয় না ।

হার্ডিং পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধাসমূহ-

- দলচ্যুত হয়ে হারিয়ে যেতে পারে।
- শিকারি প্রাণির কবলে পড়তে পারে।
- ঝড়ের কবলে পড়লে প্রানহানি ঘটতে পারে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

হার্ডিং পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ।

হার্ডিং পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধাসমূহ	হার্ডিং পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধাসমূহ
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

১.২ হাঁসের বাচ্চা ব্রুডিং

সাধারণত হাঁসের বাচ্চাকে নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত তাপ দিয়ে লালন-পালন করাকে ব্রুডিং বলে। শীতকালে ৪-৫ সপ্তাহ এবং গ্রীষ্মকালে ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং করতে হয়। বাচ্চার দেহে তাপ নিয়ন্ত্রণের কলা কৌশল বৃদ্ধি পায় না বলে ব্রুডিং করতে হয়ে।

দু'ভাবে তাপ প্রদান করে হাঁসের বাচ্চা ব্রুডিং করা যায়।

ক) প্রাকৃতিক নিয়মে অর্থাৎ ব্রুডি হাঁস/মুরগির সাহায্যে তাপ প্রদানের মাধ্যমে ব্রুডিং।

খ) কৃত্রিম উপায়ে অর্থাৎ বৈদ্যুতিক হিটার, বৈদ্যুতিক বাল্ব, কেরোসিনের বাতি ইত্যাদির মাধ্যমে তাপ প্রদানের মাধ্যমে ব্রুডিং ।

ব্রুডিং এর সুফল-

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে।
- বিভিন্ন পীড়ণ থেকে সুরক্ষিত রাখে।
- সমস্ত বাচ্চা সমানভাবে বেড়ে ওঠে।
- সঠিক শারীরিক গঠন হয়।
- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করা যায়।
- ঠান্ডা, গরম, বৃষ্টি, প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করা যায়।

প্রাকৃতিক নিয়মে হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং

গ্রামাঞ্চলে হাঁসের ডিম ফোটানোর জন্য ব্রুডি মুরগি নির্বাচন করা হয়, কারণ হাঁস ডিমে তা দেওয়ায় কম অভ্যস্ত। একটি মুরগি ১০-১৫ টি হাঁসের ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে পারে। বাচ্চা ফোটার পর প্রথমে মুরগিকে বাচ্চাসহ কয়েকদিন বদ্ধ ঘরে রেখে খাবার ও পানি প্রদান করতে হবে। ৫-৭ দিন পর একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় বাচ্চাসহ মুরগিকে ছাড়া যেতে পারে।



চিত্র: ১.৮ প্রাকৃতিক নিয়মে হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং

মুরগির সাথে বাচ্চাগুলো বাইরে ছেড়ে দেয়ার পর যদি বাচ্চাগুলো ঠান্ডা অনুভব করে তবে মুরগির পাখার নিচে চলে আসে এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। যদি পরিবেশের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে তবে বাচ্চাগুলো মুরগির সাথে স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়ায় ও খাদ্য গ্রহণ করে। যদি তাপমাত্রা বেশি অনুভব করে তবে বাচ্চাগুলো মুরগির সাথে গাছের ছায়ার নিচে চলে যায় এবং বেশি করে পানি গ্রহণ করতে চায়। ২-৩ সপ্তাহ পর বাচ্চার সঙ্গে মুরগি রাখার আর প্রয়োজন হয় না। তারপর থেকে বাচ্চাগুলোকে পানিতে ছেড়ে দিয়ে সাঁতার কাটার অভ্যাস করাতে হয়।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- ব্রুডিং কাকে বলে?
- সাধারণত কত সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চাকে ব্রুডিং করতে হয়?
- ব্রুডিং এর সুফল লেখো।
- প্রাকৃতিক উপায়ে হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং বর্ণনা করো।
- হাঁসের বাচ্চাকে কখন সাতার কাটার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়?

১.৩ ব্রুডার ঘর প্রস্তুতকরণ

ব্রুডার ঘরে বাচ্চা আনার পূর্বে ব্রুডার ঘর প্রস্তুত করতে হয়। বাচ্চা আনার পূর্বে ঘরের মেঝে, দেয়াল, বেড়া এবং উপরের সিলিং ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। জীবাণুনাশক ঔষধ যেমন ফিনাইল, আয়োসান বা অন্য কোনো ভাল জীবাণুনাশক পানির সঙ্গে মিশিয়ে ঘরের মেঝে, দেয়াল, বেড়া ইত্যাদিতে ছিটিয়ে দিয়ে ঘরকে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ব্রুডার ঘর এবং ব্রুডিং যন্ত্রপাতিসমূহ ৩-৪% ফিনাইল দ্রবণ দিয়ে সঠিকভাবে

২০২৫

ঘরের দেয়ালের উপর তার জালের বেড়া থাকলে এবং জানালায় কপাট না থাকলে বাচ্চাকে শীত অথবা বৃষ্টির কবল থেকে নিরাপদ রাখার জন্য জালের সাথে চট ঝুলিয়ে দিতে হবে। চট অবশ্যই পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত হতে হবে। অন্য সময় চট উঠিয়ে রাখতে হবে যাতে বাইরের আলো-বাতাস ঘরে ঢুকতে পারে।

ব্রুডার ঘরে যে লিটার ব্যবহার করা হবে তা রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে বাচ্চা আনার পূর্বে মেঝেতে ৫-৮ সে.মি. পুরু করে বিছিয়ে রাখতে হবে। লিটারের উপর চট বা বস্তা বিছিয়ে তার উপর পানি পাত্র ও খাদ্য পাত্র দিয়ে ঘর প্রস্তুত রাখতে হবে। ৭৫টি বাচ্চার জন্য ১টি পানি পাত্র এবং প্রতি ৪০টি বাচ্চার জন্য ১টি খাদ্য পাত্র স্থাপন করতে হবে।

ব্রুডিং যন্ত্রপাতিসমূহ বাচ্চা আনার পূর্বে ব্রুডার ঘরে স্থাপন করতে হয়। ব্রুডার ঘরে বাচ্চা নেয়ার ১২-২৪ ঘন্টা পূর্বে থেকেই ব্রুডার জ্বালিয়ে ঘর গরম করে রাখতে হয়। বাচ্চা রাখার সময় সেডের তাপমাত্রা ২৪ থেকে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে রাখতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- ব্রুডার ঘরে খাদ্য পাত্র ও পানি পাত্রের হিসাব কীভাবে নিরূপন করবে?
- ব্রুডারে বাচ্চা নেয়ার কত ঘন্টা পূর্বে ঘরের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে হবে?
- ব্রুডার ঘরের আদর্শ তাপমাত্রা কত?

১.৪. ব্রুডার ঘরে যন্ত্রপাতি ও উপকরণ স্থাপন

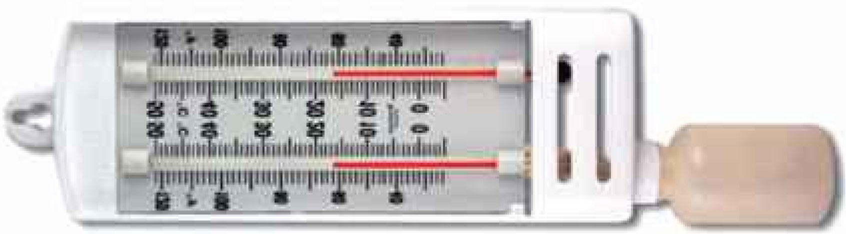
বাচ্চা ফোটার পর থেকে ৫-৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চার কাঙ্খিত পরিবেশ নিশ্চিত করাই হচ্ছে ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা। ব্রুডিংকালে হাঁসের বাচ্চার পর্যাপ্ত যত্ন নিশ্চিত করতে হবে। এ সময় হাঁসের বাচ্চার মৃত্যুহার খুব বেশি। এই সময়ে হাঁসের বাচ্চার ঘরের তাপ, আর্দ্রতা, আলো, বায়ু চলাচল সঠিক হতে হবে। উপরোক্ত বিষয়াদি পূরণের জন্য নিম্নোক্ত ব্রুডিং যন্ত্রপাতিসমূহ ব্রুডার ঘরে স্থাপন করা প্রয়োজন হয়।

১. থার্মোমিটার স্থাপন: ব্রুডার ঘরের তাপমাত্রা সঠিক আছে কি না তা জানার জন্য ব্রুডার ঘরে থার্মোমিটার স্থাপন করতে হয়।



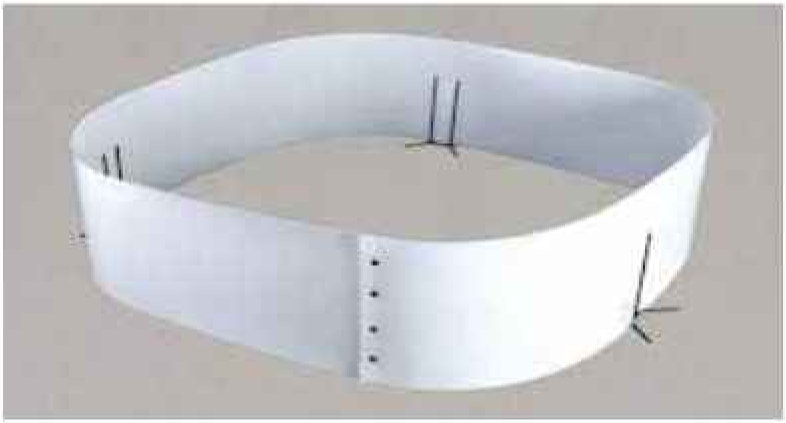
চিত্র: ১.৯ থার্মোমিটার

২. হাইগ্রোমিটার স্থাপন: ব্রুডার ঘরের আর্দ্রতা সঠিক আছে কি না তা জানার জন্য আর্দ্রতামাপক যন্ত্র যেমন হাইগ্রোমিটার স্থাপন করতে হয়। ব্রুডার ঘরের আর্দ্রতা ৪৫-৭৫% এর মধ্যে রাখতে হয়।



চিত্র: ১.১০ হাইগ্রোমিটার

৩. চিকগার্ড: ব্রুডারে বাচ্চাগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য চিকগার্ড নির্মাণ করা হয়। ব্রুডার ঘরে বাচ্চা যাতে ব্রুডার এর নিকট থেকে দূরে সরে না যায় অর্থাৎ বাচ্চাগুলো যাতে প্রয়োজনীয় তাপ পায় সে জন্য ব্রুডার এর চার পার্শ্বে হার্ডবোর্ড দ্বারা গোলাকার বেষ্টনী তৈরি করা হয়। এই বেষ্টনীকে চিক গার্ড বলা হয়। এই চিক গার্ডের উচ্চতা কমপক্ষে ৭ ইঞ্চি হলে ভালো হয়। চিক গার্ডের মধ্যে খাবার পাত্র এবং পানি পাত্র স্থাপন করতে হবে। ৩০০ সে.মি. বা ১০ ফুট ব্যাসের ১টি চিকগার্ডে ৩০০-৪০০টি হাঁসের বাচ্চাকে স্বাভাবিকভাবে ব্রুডিং করা যায়। তবে বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে চিক গার্ডের পরিধি বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। এই চিকগার্ড নেটের মাধ্যমেও তৈরি হতে পারে। শীতের দিনে চিকগার্ড হার্ড বোর্ডের এবং গরমের দিনে নেটের তৈরি হওয়া ভালো। চিকগার্ডকে ব্রুডার গার্ডও বলা হয়। ৪ সপ্তাহের মধ্যে চিকগার্ড সরিয়ে বাচ্চা সমস্ত ঘরে ছেড়ে দিতে হবে।



চিত্রঃ ১.১১ চিকগার্ড

৪. ব্রুডারঃ ব্রুডার হল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র যা দ্বারা ব্রুডার ঘরের তাপমাত্রা ঠিক রাখা হয়। চারটি ১০০ ওয়াট বাল্বের সাহায্যে এক মিটার পরিধির একটি ব্রুডার তৈরি করে তাতে ৩০০(তিনশত)টি বাচ্চা পালন করা যায়। কাঠ, টিন, হার্ডবোর্ড ইত্যাদির সাহায্যে ব্রুডার বানানো যায়। এক ফুট উঁচু পায়ার উপর শুধু কাঠ বা হার্ডবোর্ডের সাহায্যে অথবা কাঠ এবং হার্ডবোর্ডের সমন্বয়ে সহজভাবে ইলেকট্রিক ব্রুডার তৈরি করা যায়। ব্রুডারে ছাতার মত অংশটিকে হোভার বলে। বাল্বসহ হোল্ডার হোভারের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়।



চিত্রঃ ১.১২ হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং

৫. খাবার পাত্র : হাঁসের বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী ব্রুডার ঘরে সঠিকভাবে খাবার পাত্রগুলো স্থাপন করতে হবে। প্রথম ২-৩ দিন কাগজের উপরে, থালা বা ট্রেতে খাবার দিতে হয়। তারপর থেকে খাবার পাত্রে খাবার দিতে হয়। ২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত প্রতিটি বাচ্চার জন্য এক লিনিয়ার ইঞ্চি জায়গার দরকার হয়। ২-৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত প্রতি বাচ্চার জন্য জায়গা দিতে হয় ১.৫ লিনিয়ার ইঞ্চি।



চিত্র: ১.১৩ খাদ্য পাত্র

৬. পানি পাত্র : ব্রুডার ঘরে খাবার পাত্রের চেয়ে পানি পাত্র স্থাপনের প্রয়োজন হবে অর্ধেক। অর্থাৎ পানি পাত্রের জায়গা হবে খাবার পাত্রের অর্ধেক।



চিত্র: ১.১৪ পানি পাত্র

৭. লিটার : ঘরের মেঝেতে যে তুষ বা কাঠের গুঁড়া বিছানা হিসেবে দেয়া হয় তাকে লিটার বলে। লিটার মেঝেতে ৫-৮ সে.মি. পুরু করে বিছিয়ে দিতে হবে। ভিজা, স্যাঁতস্যাঁতে ও ময়লা হলে লিটার পাল্টিয়ে দিতে হবে।



চিত্রঃ ১.১৫ লিটার

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- ব্রুডার ঘরে যে সকল যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হয় সেগুলোর তালিকা প্রস্তুত করো।
- ১০ ফুট ব্যাসের ১টি চিকগার্ডে কতটি বাচ্চা ব্রুডিং করা যায়?
- কীভাবে তুমি একটি ব্রুডার ঘর প্রস্তুত করবে তা ধারাবাহিকভাবে লেখো।

১.৫ বয়স অনুযায়ী ব্রুডিং তাপমাত্রা

হাঁসের বাচ্চার সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য পরিমিত তাপমাত্রার প্রয়োজন। তাপমাত্রার অতিরিক্ত কম বা বেশি হলে বাচ্চা অসুস্থ হয়ে যায়। ব্রুডার ঘরের তাপমাত্রা নির্ণয় করার জন্য থার্মোমিটার থাকে। হাঁসের বাচ্চাকে গ্রীষ্মকালে ২-৪ সপ্তাহ এবং শীতকালে ৪-৬ সপ্তাহ ব্রুডিং করা হয়। ব্রুডিংকাল অত্যন্ত সংবেদনশীল বিধায় গভীর পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়।

ব্রুডার ঘরে নিম্নলিখিতভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়-

শীতকালে ১০০টি বাচ্চার জন্য ১০০ ওয়াট বা প্রয়োজনবোধে তদূর্দ্ধ ওয়াটের বাল্বের ব্যবস্থা করতে হয়। হোভার উঁচু নিচু করে তাপমাত্রা কমানো বাড়ানো যায়। গরমকালে ৩০০টি বাচ্চা পালনের জন্য হোভারের চার কোণায় চারটি ৬০ ওয়াট এর বাল্ব দিয়েই ব্রুডিং করা যায়।

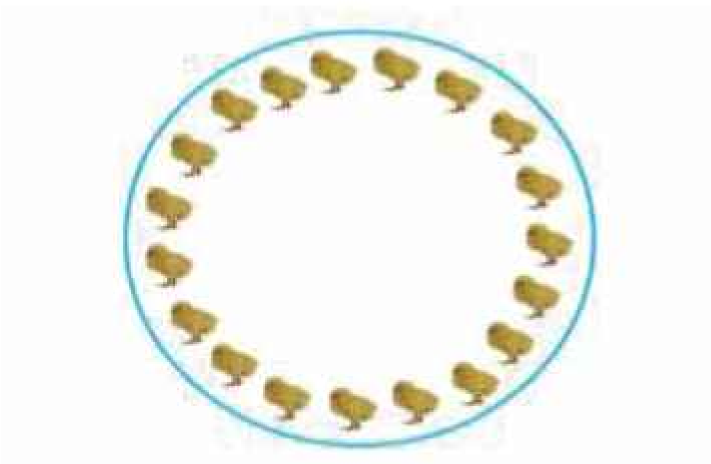
বিভিন্ন বয়সে ব্রুডিং ঘরের তাপমাত্রা-

বয়স (সপ্তাহ)	প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা	
	ডিগ্রি ফারেনহাইট	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
প্রথম	৯৫	৩৫
দ্বিতীয়	৯০	৩২.২
তৃতীয়	৮৫	২৯.৪
চতুর্থ	৮০	২৬.৬
পঞ্চম	৭৫	২৩.৮
ষষ্ঠ	৭০	২১.১

২০২৫

১/২ ডিগ্রি তাপমাত্রা কম বা বেশি হলে বাচ্চার বৃদ্ধিতে তেমন অসুবিধা হয় না। ব্রুডিং এর পর বাচ্চা পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। যে তাপমাত্রায় বাচ্চাগুলো ব্রুডার ঘরে আরাম অনুভব করবে সে তাপমাত্রাতেই ঘর গরম রাখতে হবে। তাই ঘরে থার্মোমিটার না থাকলেও বাচ্চার অবস্থান দেখে ব্রুডার ঘরের তাপমাত্রা বোঝা যায়। নিচে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

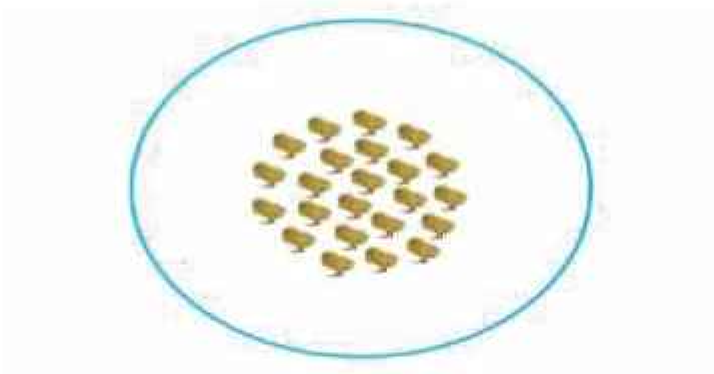
১. ব্রুডার ঘরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে বাচ্চাগুলো ব্রুডার, হিটার বা তাপের উৎস থেকে দূরে অবস্থান করবে এবং মুখ হা করে শ্বাস নিতে থাকবে এবং হাঁপাতে থাকবে। নিচের ছবিতে চিত্রটি দেখানো হল-



চিত্রঃ ১.১৬ বেশি তাপমাত্রায় ব্রুডারে বাচ্চার অবস্থান

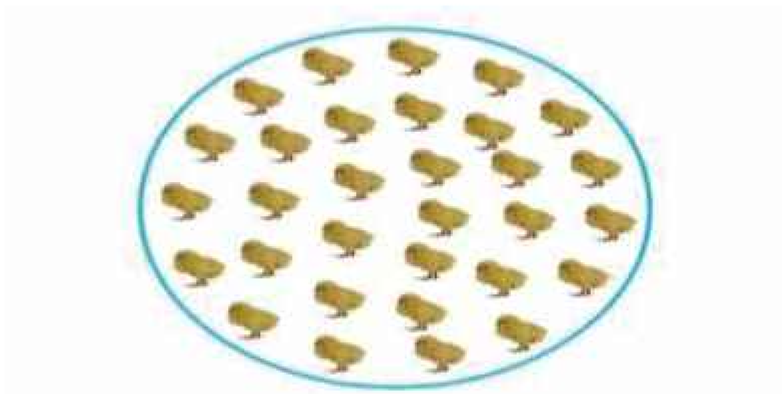
এ সময়ে বাচ্চাগুলো খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দেয়। এ অবস্থায় ব্রুডার-এর মধ্যে বাচ্চাগুলোর জন্য আরামদায়ক তাপমাত্রা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাপমাত্রা কমিয়ে দিতে হবে। ব্রুডারে যদি বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যবহার করা হয় তা হলে বাল্বের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে অথবা হোভার উঁচু করে তাপমাত্রা কমানো যায়।

২. ব্রুডার ঘরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে বাচ্চাগুলো ব্রুডার হিটার- এর নিকটে ঘনভাবে জড়ো হয়ে থাকবে এবং চিঁচিঁ শব্দ করে ডাকতে থাকে। অনেক সময় বাচ্চাগুলো হোভারের নিচে গাদাগাদি করে জমা হতে গিয়ে চাপা পড়ে বা শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারে। তাছাড়া বাচ্চাগুলো হোভারের নিচে থাকার কারণে পানি ও খাবার না খেয়ে দুর্বল হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য ব্রুডারে বাল্বের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ঘরে যাতে ঠান্ডা বাতাস না ঢুকে সেজন্য নেট লাগানো অংশে ভারী পর্দা লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।



চিত্রঃ ১.১৭ কম তাপমাত্রায় ব্রুডারে বাচ্চার অবস্থান

৩. ব্রুডার ঘরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা পরিমিত পরিমাণে থাকলে বাচ্চাগুলো ঘরে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করে এবং ঠিকমত খাদ্য গ্রহণ ও পানি গ্রহন করে।



চিত্রঃ ১.১৮ সঠিক তাপমাত্রায় ব্রুডারে বাচ্চার অবস্থান

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- বিভিন্ন বয়সে ব্রুডিং তাপমাত্রা লেখো।
- ব্রুডারে তাপমাত্রা বেশী হলে বাচ্চার আচরণে কী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়?
- ব্রুডারে তাপমাত্রা কম হলে বাচ্চার আচরণে কী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়?
- কীভাবে তুমি বুঝবে যে ব্রুডারে সঠিক তাপমাত্রা বিরাজ করছে?

১.৬ ব্রুডার ঘরে খাদ্য পাত্র ও পানি পাত্র স্থাপন

ব্রুডার ঘরে খাবার পাত্র ও পানি পাত্র বাচ্চার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ঘরে স্থাপন করতে হবে। ২০২৫

খাবার পাত্র স্থাপন

ব্রুডার ঘরে বাচ্চাগুলোকে প্রথম ১-২ দিন খবরের কাগজের উপর এবং পরবর্তীতে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত ট্রেতে করে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। ১০০ টি বাচ্চা ১টি ট্রেতে খেতে পারে এমন ট্রে ঘরে স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ ১০০টি বাচ্চার জন্য ১০০ লিনিয়ার ইঞ্চি বিশিষ্ট ট্রে ব্যবহার করতে হবে। ২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত খাদ্য প্রদানের জন্য ট্রে ব্যবহার করা যায়। তারপর খাবার পাত্র ব্যবহার করতে হয়।



চিত্র: ১.১৯ ব্রুডারে খাদ্য পাত্র ও পানি পাত্রের অবস্থান

প্রতিটি হাঁসের জন্য বয়স অনুযায়ী খাবার পাত্রের জায়গার পরিমাণ

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতিটি হাঁসের জন্য জায়গা	
	ডিম উৎপাদনকারী জাত	মাংস উৎপাদনকারী জাত
একদিন থেকে ৪ সপ্তাহ	১ লিনিয়ার ইঞ্চি	১.৫ লিনিয়ার ইঞ্চি
৫ হতে ৮ সপ্তাহ	২ লিনিয়ার ইঞ্চি	৩.০ লিনিয়ার ইঞ্চি
৯ হতে ১২ সপ্তাহ বা তার উপরে	৩ লিনিয়ার ইঞ্চি	৪.০ লিনিয়ার ইঞ্চি

ডিম থেকে ফোটার পর বাচ্চা ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত কোনো খাবার না খেয়েই থাকতে পারে। এজন্যেই একদিন বয়সের বাচ্চা (Day old chick) এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সহজেই পরিবহন করা যায়।

২০২৬



চিত্রঃ ১.২০ বিভিন্ন ধরনের খাবার পাত্র

পানি পাত্র স্থাপন

পানি পাত্রের জায়গা হবে খাবার পাত্রের অর্ধেক। হাঁসের বেলায় পানি সরবরাহের পর খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। এক্ষেত্রে পানি পাত্রের গভীরতা কমপক্ষে ৩ (তিন) ইঞ্চি হতে হবে যাতে হাঁস মাথা ঢুকিয়ে পানি পান করতে পারে। তা না হলে হাঁসের খাদ্য গ্রহণ অনেকটা কমে যায়।





চিত্র: ১.২১ বিভিন্ন ধরনের পানি পাত্র

বয়স অনুযায়ী পানি পাত্রের জায়গার পরিমাণ নিম্নরূপ:

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতিটি হাঁসের জন্য জায়গা	
	ডিম উৎপাদনকারী জাত	মাংস উৎপাদনকারী জাত
একদিন থেকে ৪ সপ্তাহ	১ লিনিয়ার ইঞ্চি	১.৫ লিনিয়ার ইঞ্চি
৫ হতে ৮ সপ্তাহ	২ লিনিয়ার ইঞ্চি	৩.০ লিনিয়ার ইঞ্চি
৯ হতে ১২ সপ্তাহ বা তার উপরে	৩ লিনিয়ার ইঞ্চি	৪.০ লিনিয়ার ইঞ্চি

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- ব্রুডার ঘরে পানি পাত্র স্থাপনের কৌশল লেখো।
- ব্রুডার ঘরে খাদ্য পাত্র স্থাপনের কৌশল লেখো।
- Day old chick বলতে কী বোঝায়?
- বয়স অনুযায়ী পানি পাত্রে জায়গার পরিমান লেখো।

১.৭ হাঁসের বাচ্চা আবাসনের সময় করণীয় পদক্ষেপ

বাচ্চা আবাসনের পূর্বেই হার্ডবোর্ড বা তারের নেট দিয়ে চিক গার্ড তৈরি করে মেঝেতে পরিমাণমত (২-৩ ইঞ্চি পুরু করে) তুষ/কাঠের ভূষি বিছিয়ে এর উপর খবরের কাগজ কয়েক স্তরে অথবা পাতলা চট বিছিয়ে নিতে হবে। এ কাগজ দিনে একবার বদলিয়ে দিতে হবে। পাতলা চট দৈনিক একবার পরিষ্কার করে শুকিয়ে পুনরায় বিছাতে হবে।

বাচ্চা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা হ্যাচারি থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করে এনে পূর্ব থেকে প্রস্তুতকৃত ব্রুডার ঘরে ৪৫ মিনিট বাচ্চাগুলোকে বাক্সের মধ্যেই রাখতে হবে। কারণ অন্য পরিবেশ থেকে আনার পর ব্রুডারের পরিবেশের

২০২৫

সাথে খাপ খাইয়ে নিতে কিছু সময় লাগবে। এ সময় পর কিছু বাচ্চাকে ব্রুডারে ছাড়তে হবে। পনেরো মিনিট পর সবগুলো বাচ্চা ব্রুডারে ছাড়তে হবে। এতে পরের বাচ্চাগুলো পূর্বের বাচ্চাগুলোকে অনুসরণ করে দ্রুত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। চিকগার্ডের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পানি পাত্র ও খাদ্য পাত্র স্থাপন করতে হবে।

পানি পাত্রগুলো দিনে ২-৩ বার পরিষ্কার করতে হবে। সপ্তাহে একবার পানি পাত্রগুলো জীবাণুনাশক ঔষধ, আইওসান দিয়ে ধুইয়ে নিতে হবে। বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে চিকগার্ডের পরিধি বৃদ্ধি করে ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যে সারা ঘরে লিটার বিছিয়ে বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে। সেই সাথে সমস্ত ঘরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদ্য পাত্র ও পানি পাত্র স্থাপন করতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ রক্ষার্থে প্রতিদিন ঘরের লিটারে আচঁড়া দিয়ে নেড়ে উল্টে-পাল্টে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। লিটার ভিজে গেলে তা সাথে সাথে পরিবর্তন করে সেখানে শুকনা লিটার বিছিয়ে দিতে হবে।

বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে ঘরের পর্দাগুলো খুলে দিতে হবে যাতে ঘরের মধ্যে প্রয়োজনমত বায়ু চলাচল করতে পারে যা লিটার শুকনা রাখতে সাহায্যে করে।

শীতকালে ৪-৫ সপ্তাহ এবং গ্রীষ্মকালে ২-৩ সপ্তাহ কৃত্রিম উপায়ে তাপ দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। দুই সপ্তাহ বয়স থেকে হাঁসের বাচ্চাকে পানিতে চড়ার অভ্যাস করাতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- ব্রুডারে বাচ্চা ছাড়ার পূর্বে কী কী কাজ করতে হয় তা ধারাবাহিকভাবে লেখো।
- সাধারণত চিকগার্ড তৈরির জন্য কোন কোন উপাদান ব্যবহার করা হয়?
- লিটার ভিজে গেলে কী করতে হবে?

১.৮ ব্রুডার ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্তকরণ

জীবাণুনাশক: যে সব ঔষধ বা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করলে জীবাণু/রোগ জীবাণু মারা যায় তাই হলো জীবাণুনাশক। যথা: ফিনাইল, আয়োসান, স্যাভলন, ডেটল, সুপারসেপ্ট ইত্যাদি। জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহারের সাথে খামারে স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য উন্নত ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা দরকার। জীবাণুনাশক ঔষধ উন্নত ব্যবস্থাপনার বিকল্প নয়।

কখন জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার করতে হয়?

- প্রতিবার নতুন হাঁসের ঝাঁক খামারে তোলার পূর্বে উপযুক্ত জীবাণুনাশক ঔষধ বা রাসায়নিক দিয়ে ধুয়ে বা স্প্রে করে রোগ জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

- খামারে কোন মহামারি দেখা দিলে।
- খামারে সংক্রামক রোগের উপস্থিতি প্রমাণিত হলে।
- অসুস্থ হাঁস দ্বারা ব্যবহৃত আসবাবপত্র বা যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
- ডিম ফোটানোর যন্ত্র প্রতিবার ডিম বসানোর পূর্বে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।
- ফোটানোর জন্য নির্ধারিত ডিম জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে প্রয়োজন মত ধুয়ে নিতে হবে।

একটি আদর্শ জীবাণুনাশক নিম্নলিখিত গুণসম্পন্ন হতে হবে-

- দামে সস্তা হতে হবে।
- দ্রুত পানির সাথে মিশে বা মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে।
- মানুষ ও অন্যান্য পশু পাখির জন্য বিষাক্ত হবে না।
- সহজ প্রাপ্য হবে।
- কার্যকর হতে হবে।
- পাত্রের বা ঘরের অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিকর হবে না।
- গুদামজাত করার কারণে ব্যবহার সময় সীমার মধ্যে গুণগতমান নষ্ট হবে না।
- বিশ্রী দুর্গন্ধ মুক্ত হবে। সুগন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- বিষক্রিয়ার ক্ষমতা অনেক দিন পর্যন্ত জমে থাকবে না।
- মাংস/ডিমের মাধ্যমে বিষাক্ততা ছড়াবে না।

আজকাল বাজারে অনেক ধরনের জীবাণুনাশক ঔষধ কিনতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাঁসের খামারকে রোগ জীবাণুমুক্ত রাখা যায় কিন্তু সব পদ্ধতি সব ক্ষেত্রে সমভাবে কার্যকরী নয়। প্রতিটি জীবাণুনাশক ঔষধ তৈরির কোম্পানি কর্তৃক দেয়া নির্দেশিকা অনুসারে ব্যবহার করতে হবে। কোম্পানি কর্তৃক নির্দেশনা অনুসরণ না করলে খামার রোগ জীবাণুমুক্ত হবে না বরং খামারে বিদ্যমান রোগ জীবাণুগুলো অধিক শক্তিশালী হয়ে খামারের হাঁসগুলোর মধ্যে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। জীবাণুনাশক ঔষধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক শক্তি সম্পন্ন বিভিন্ন রোগ জীবাণু পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে জনস্বাস্থ্যকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলবে।

এদেশে বহুল ব্যবহৃত কতকগুলো রোগ জীবাণুনাশক ঔষধের নাম, ব্যবহার বিধি নিম্নের ছকে দেওয়া হলো-

ঔষধের নাম	ঔষধ ও পানির অনুপাত (ঔষধ : পানি)	ব্যবহার পদ্ধতি
১। ফিনল	৫:১৫	স্প্রে করা/ধুয়ে দেয়া
২। ফিনাইল	১:৪৯	স্প্রে করা/ধুয়ে দেয়া
৩। ডেটল	১:১৫৯	স্প্রে করা/ধুয়ে দেয়া
৪। স্যাভলন	১:১৯৯	স্প্রে করা/ধুয়ে দেয়া
৫। আয়োসান	১:৩৯	স্প্রে করা/ধুয়ে দেয়া
৬। ক্রিজল	১:৯৮	স্প্রে করা/ধুয়ে দেয়া

৭। ডায়জিনন পাউডার	১:১০০০	স্প্রে করা
৮। পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট	১:১০০	ধুয়ে দেয়া
৯। ব্লিচিং পাউডার	১:২০০	ধুয়ে মুছে দেয়া
১০। কাপড় কাচার সোডা	৪:৯৬	ধুয়ে মুছে দেয়া
১১। চুন পাউডার	৫:৯৫	ধুয়ে মুছে দেয়া
১২। ফরমালডিহাইড ৪০%	১:৯৯	স্প্রে করা, ফিউমিগেশন
১৩। লাইজল	২:৯৮	স্প্রে করা, ধুয়ে মুছে দেয়া
১৪। সুপারসেপ্ট	২:৫০	স্প্রে করা, ধুয়ে মুছে দেয়া

জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহারে সতর্কতাসমূহ-

- অধিকাংশ রোগ জীবাণুনাশক ঔষধ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তাই ব্যবহার করার সময় যাতে চোখে, মুখে না ঢোকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহারের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘর থেকে বের হয়ে আসতে হবে।
- ফরমালিন ও পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট একত্রে মিশ্রিত হলে (ফিউমিগেশন) মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হয় যা মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাই ফিউমিগেশন প্রক্রিয়াটি সাবধানতার সহিত করতে হয়।
- রোগ জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার করার পর ঘরটি কয়েক দিনের জন্য খালি রাখতে হবে।
- চুন পাউডার/কাপড় কাচার সোডা লিটারের সাথে ব্যবহার করলে পানির পরিবর্তে লিটারের তুষ বা কাঠের গুড়ার ওজনের সাথে অনুপাত নির্দিষ্ট করতে হবে।
- নতুন বা পুরাতন যেকোনো ঘর হোক না কেন "অল ইন অল আউট" পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। একটি ঘরে এক ব্যাচ হাঁস পালন করে বিক্রয় করার কমপক্ষে ১৪ দিন পর অন্য ব্যাচ উঠাতে হবে। এ পদ্ধতি শুধু রোগ প্রতিরোধই করে না বরং রোগের জীবাণুকেও ধ্বংস করতে সহায়তা করে।

ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে-

- হাঁস বিক্রয় করার পর সমস্ত সরঞ্জাম বের করতে হবে।
- পুরাতন লিটার ফার্ম থেকে কমপক্ষে ৫০০ মিটার দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- ঘরের দেয়াল, পর্দা, ভেন্টিলেটর, দরজা, জানালা, নেট, ফ্যান, বাল্ব ইত্যাদি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।
- ঘরে কোনো মেরামত, সংস্কার প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- পরিষ্কার পানি দিয়ে দেয়াল, মেঝে, খাদ্য পাত্র ও পানি পাত্র ধুয়ে দিতে হবে। পাইপ দিয়ে উচ্চ চাপযুক্ত পানি প্রবাহের মাধ্যমে ঘর পরিষ্কার করা উত্তম।
- জীবাণুনাশক (পভিসেপ, সুপারসেপ্ট, আয়োসান) দিয়ে খাবার পাত্র, পানি পাত্র, দেয়াল, মেঝে, ছাদ, পর্দা ও খামারের আশেপাশ জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

২০১৫

- ভিজা মেঝেরে উপর ১০০ বর্গফুট ১ কেজি হারে শুকনা কস্টিক সোডা ছড়াতে হবে এবং ১৫ মিনিট অপেক্ষার পর মেঝে শুকিয়ে গেলে কস্টিক সোডার উপর হালকা করে পানি স্প্রে করে ঘর ধুয়ে ফেলতে হবে।



চিত্র: ১.২২ উচ্চ চাপযুক্ত পানি প্রবাহের মাধ্যমে ঘর পরিষ্কার

- ঘরের চারপাশে ৫-৬ ফুট পরিমাণ জায়গায় ঘাস কেটে পরিষ্কার করতে হবে এবং পুরাতন মুরগির ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে ব্লিচিং পাউডার ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাচ্চা উঠানোর ৬ দিন পূর্বে সমস্ত জিনিসপত্র আবার জীবাণুমুক্ত করে শুষ্ক করে ভিতরে রাখতে হবে।
- বাচ্চা ব্রুডিং এর ১ দিন পূর্বে লিটার বিছাতে হবে। ঘরে সমস্ত সরঞ্জামাদি স্থাপন করে বাচ্চা গ্রহণের ১২ ঘন্টা পূর্বে সম্পূর্ণ ঘর, চট বা পলিথিন দিয়ে ঘিরে ফিউমিগেশন উপকরণ ব্যবহার করে ঘর ফিউমিগেশন করতে হবে।
- ফিউমিগেশনের জন্য প্রতি ১০০ ঘনফুট স্থানের জন্য ৬০ গ্রাম পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট ও ১২০ সি:সি: ফরমালডিহাইড ব্যবহার করতে হয়।
- ফিউমিগেশন করার ৩০ মিনিট পর পর্দা সরিয়ে সম্পূর্ণ গ্যাস বের করে দিতে হবে।
- ফিউমিগেশনের পর বাচ্চা তোলার ২/৩ ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত ঘর তালাবদ্ধ রাখতে হয়।
- বাচ্চা উঠানোর কয়েকদিন পূর্ব থেকেই ঘরের ফুটবাথে জীবণুনাশক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাচ্চা উঠানোর পর প্রতিদিন ১ বার করে ঘরের বাইরের চতুপার্শ্বে ৫% ফরমালিন দ্বারা স্প্রে করতে হবে।
- নিরাপত্তার স্বার্থে ঘরের আশেপাশে কোনো প্রাণি বা লোক চলাচল বন্ধ রাখতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- জীবাণুনাশক ঔষধ কাকে বলে?
- জীবাণুনাশক ঔষধ কখন ব্যবহার করতে হয়?
- একটি আদর্শ জীবাণুনাশক ঔষধের ৫টি গুণাবলী লেখো।
- জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহারের সময় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়?
- ফিউমিগেশন করার পদ্ধতি লেখো।
- "অল ইন অল আউট" পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?

১.৯ বাসস্থান এবং এর পারিপার্শ্বিকের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বাজায় রাখার কৌশল

বাসস্থান এবং এর আশেপাশের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে-

- খামার যাতে পানি জমে স্যাঁতস্যাঁতে না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- হাঁসের জাত ও উদ্দেশ্য হিসেবে প্রয়োজনীয় পরিমাপের ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি করে তৈরি করতে হবে, যাতে হাঁস পর্যাপ্ত আলো বাতাস পায়।
- হাঁসের খামারের উপরিভাগে তারের জাল দিতে হবে যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে।
- ঘরে যাতে বৃষ্টির ঝাপটা পড়ে লিটার ভিজে না যায় সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা খুব বৃদ্ধি পেলে তাপ কমানোর জন্য ঘরের চালে পানি ছিটাতে হবে।
- ঘরের চারিদিকে পানি ছড়াতে হবে।
- ঘরের মধ্যে ফগিং মেশিন দিয়ে পানি স্প্রে করে কুয়াশা তৈরি করতে হবে।
- ঘরের ভেতরে ও বাইরে ফ্যান চালাতে হবে।
- খামারে নতুন বাচ্চা উঠানোর আগে খামার সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। প্রথমে পানি দ্বারা পরিষ্কার করে পরে পানির সাথে জীবাণুনাশক মিশিয়ে খামার জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- হ্যাচারি থেকে সুস্থ সবল বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে। তা না হলে সালমোনেলোসিস, মাইকোপ্লাজমোসিস ইত্যাদি রোগ হ্যাচারি থেকে খামারে আসতে পারে।
- খামারে ভালো খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত খাদ্যের মাধ্যমে অ্যাসপারজিলোসিস ও বিষক্রিয়াসহ জটিল রোগ হতে পারে।
- খামারে মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতিবার খামারে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময় জীবাণুনাশক ব্যবহার করে হাত ও পা অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- খামারে যাতে বন্য প্রাণী ও ইঁদুর প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বর্জ্য পদার্থ, বিষ্ঠা, লিটার নিয়মিত পরিষ্কারসহ হাঁসের ঘরের ভেতরের পরিবেশ অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে।
- খামারে কোনো হাঁস অসুস্থ হলে যত দ্রুত সম্ভব পৃথক করে ফেলতে হবে। হাঁস মারা গেলে তা সাথে সাথে সরিয়ে নিয়ে অবশ্যই মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- খামারে কোনো জটিল সমস্যা দেখা দিলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- হাঁসের খামারের ঘর কোনদিকে লম্বালম্বি করে তৈরি করতে হয়?
- গ্রীষ্মকালে ঘরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তাপ কমানোর জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে?
- হাঁসের খামার কীভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হয়?
- বাসস্থান এবং এর পারিপার্শ্বিকের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার কৌশল বর্ণনা করো।

১.১০ খামারের জীব নিরাপত্তা (বায়োসিকিউরিটি)

বর্তমান বিশ্বে খামার সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে একটি বহুল আলোচিত শব্দ বায়োসিকিউরিটি। খামার স্থাপনের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে খামার পরিকল্পনা, উৎপাদন ও উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ, এমনকি ভোক্তার কাছে উৎপাদিত দ্রব্য পৌছে দেওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়াগুলো আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তথা জীবাণুমুক্ত ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের প্রভাবমুক্তভাবে সম্পন্ন করাই জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

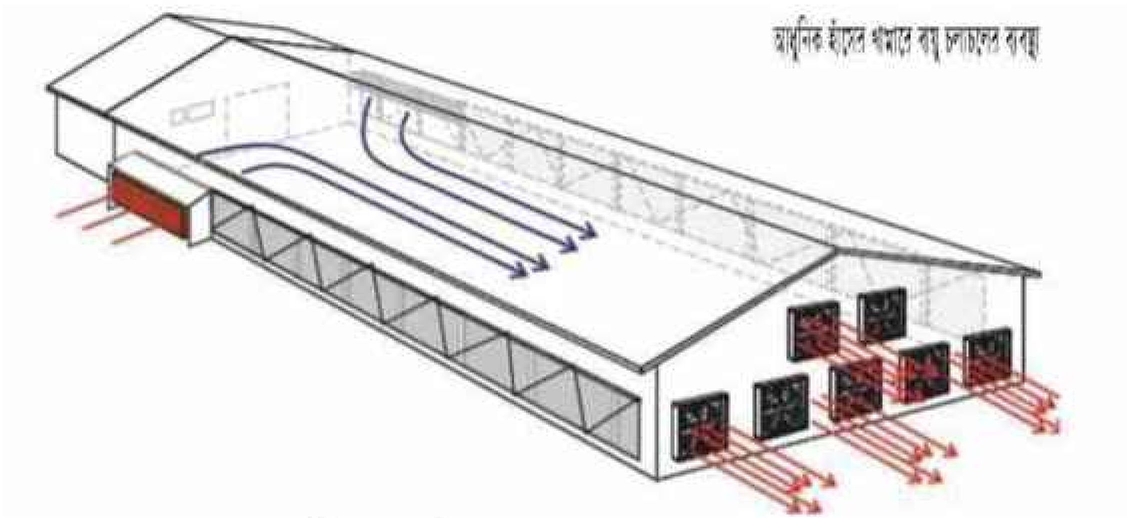
জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য-

- বহিরাগত রোগজীবাণু যেমন : বার্ড ফ্লু জাতীয় রোগের কবল থেকে খামার রক্ষা করা।
- মানুষের মাধ্যমে ছড়ায় এমন রোগ জীবাণু যেমন- সালমোনেলা থেকে খামারকে রক্ষা করা।
- খামারের সার্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান।
- রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যয় কমানো, লাভজনক উপায়ে খামার গড়ে তোলা, জনস্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকি কমানো।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখলে জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা সঠিকভাবে মেনে চলা যাবে :

১. খামারের স্থান নির্বাচন

- পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি করে ঘর তৈরি করতে হবে।
- চারিদিকে খোলা মেলা, প্রচুর আলো-বাতাস চলাচলে সক্ষম এমন স্থান বেছে নিতে হবে।
- লোকালয় থেকে দূরে কিন্তু খামারের পণ্য বাজারজাতকরণের ভালো যোগাযোগ সুবিধাসম্পন্ন ও শহর থেকে অনতি দূরে খামারের স্থান নির্বাচন করতে হবে।
- খামারে পর্যাপ্ত পানি ও বিদ্যুতের সুবিধা থাকতে হবে।
- অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে খামার স্থাপন করতে হবে।



চিত্রঃ ১.২৩ হাঁসের খামারের বায়ু চলাচল ব্যবস্থা

২. রোগ জীবাণুর উৎস ও প্রতিরোধের উপায় নির্বাচন

রোগ জীবাণুর উৎসসমূহ

- বাহক পাখি, বাইরে থেকে আমদানিকৃত জীবাণুবাহী ডিম ও ১ দিন বয়সের বাচ্চা, আক্রান্ত ডিম ও হাঁস, মানুষের হাত-পা ও পোশাকাদি, ধুলাবালি, পালক, বিষ্ঠা ও জৈব বর্জ্য, বন্যপাখি, শিকারি জীবজন্তু, ইঁদুর ইত্যাদি।
- দূষিত পানি, খাদ্য, বাতাস ইত্যাদি।
- রোগ জীবাণু দ্রুত সরবরাহের যন্ত্রপাতি যথা- ট্রাক, খাচা, ডিমের পাত্র ইত্যাদি।

রোগ বিস্তার প্রতিরোধের উপায়

(ক) যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ

- যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের জন্য খামারের প্রবেশদ্বার বন্ধ রাখতে হবে।
- সব ধরনের দর্শনার্থী প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- খামারের কর্মীদের খামারে ব্যবহৃত জুতা ও পোশাকাদি আলাদা রাখতে হবে এবং সেগুলো খামারের বাইরে বের করা যাবে না।
- খামারে প্রবেশের পূর্বে ও পরে হাত পা জীবাণুনাশক দিয়ে ধুতে হবে ও শরীরের বহিরাংশে জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে।
- খামারের বন্যপ্রাণি, পোষাপাখি ও অন্যান্য জীব-জন্তু প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- এক খামারে একই বয়সের হাঁস পালন করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে একটি ঘরে একই বয়সের হাঁস রাখতে হবে।

২০২৫

(খ) খামারে অবাধ প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ

- দর্শনার্থীদের জন্য একটি তথ্য বই সংরক্ষণ করতে হবে। খামার পরিদর্শনকারীর নাম-পরিচয়, সাক্ষাৎকারের তারিখ-সময় ইত্যাদি তথ্য বইয়ে লিপিবদ্ধ করে খামারের নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- খামারকর্মী ও খামার পরিদর্শনকারী বহিরাগত উভয়কেই কাজ করার সময় বা খামার পরিদর্শনের সময় জীবাণুমুক্ত জুতা ও পোশাকাদি পরিধান করতে হবে। পরিদর্শন ও কাজের শেষে পুনরায় এদের জীবাণুমুক্ত করা আবশ্যক।
- উপকরণ সরবরাহকারী বাস/ট্রাক ড্রাইভার ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের যথাসম্ভব জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।
- বন্যপাখি নিয়ন্ত্রণের জন্য খামার ঘরের চারদিকে আলো বিকিরণকারী অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল বেঁধে দিতে হবে।



চিত্র: ১.২৪ প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত বিষয়ক নির্দেশনা

গ) চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর তৎপরতা

- পোল্ট্রি খামারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা অথবা চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত চিকিৎসক অথবা স্বাস্থ্যকর্মীকে জৈব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে।
- প্রতিটি আলাদা শেডে ঢোকার পূর্বে ও পরে জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে হাত-পা ধৌত করতে হবে। সম্ভব হলে আলাদা অ্যাপ্রন, হাত পায়ের মোজা ও মাথার আবরণী ব্যবহার করতে হবে।
- খামারে নিয়োজিক কর্মীবৃন্দ, খামারে প্রবেশকারী যানবাহন, চালক ও সংশ্লিষ্ট সহায়ক কর্মীবৃন্দের যেকোনো ধরনের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবেন।
- ময়নাতদন্ত করার জন্য বাতাসের অনুকুলে এমন জায়গা বেছে নিতে হবে যেখান থেকে বাতাসের মাধ্যমে খামারে জীবাণু প্রবেশের কোন সম্ভাবনা নেই। ময়নাতদন্ত শেষে স্থানটি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

৩. নিয়মিত টিকা প্রয়োগ

খামারে হাঁসকে টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ-মুক্ত রাখা একটি আধুনিক, জটিল ও অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া। আধুনিককালে পোল্ট্রি শিল্পের সাফল্য সময়মত ও সফলভাবে টিকা প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই টিকা প্রয়োগকালে সর্বোচ্চ সতর্কতা পালন করা বাঞ্ছনীয়।

টিকা প্রদানের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে-

- হ্যাচারির সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরত স্বাস্থ্যকর্মীকে ১ দিন বয়সী বাচ্চার প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে খামারিদের ধারণা দিতে হবে। বাচ্চার শরীরের এন্টিবডি টাইটার লেভেল নির্ণয় করে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বাচ্চার টিকা প্রদান কর্মসূচি নির্ণয় করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হ্যাচারির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে।
- সঠিকভাবে উৎপন্ন, সংরক্ষিত, পরিবাহিত টিকা প্রদান করতে হবে।
- আমাদের দেশের স্থানীয় পর্যায়ে আক্রমণকারী জীবাণুর স্ট্রেইন সম্বন্ধে ভালোভাবে ধারণা নিয়ে সেই অনুযায়ী টিকা প্রদান করতে হবে। অপরিচিত স্ট্রেইন দ্বারা প্রস্তুত টিকা প্রদান করলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।
- নির্দেশনা অনুযায়ী শ্রেণিভেদে টিকা প্রদানের সঠিক মাধ্যম অনুসারে টিকা প্রদান করতে হবে। যেমন- জীবন্ত টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে খাবার পানি, স্প্রে বা চোখে ফোঁটা প্রদানের মাধ্যমে ও মৃত জীবাণু দ্বারা প্রস্তুতকৃত টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে।
- অসুস্থ হাঁসকে টিকা প্রয়োগ করা যাবে না।
- টিকা প্রদানের পূর্বে ভিটামিন এ, ডি ও ই ব্যবহার করা ভালো।
- টিকা প্রদানের পর ভিটামিন সি, ভিটামিন ই ও সেলেনিয়াম ব্যবহার করা ভালো।



চিত্র: ১.২৫ হাঁসের নিয়মিত টিকা প্রদান

৪. নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা

- প্রতি সপ্তাহে হাঁসের খাদ্য ও পানি গ্রহণের পরিমাণ, ওজন ইত্যাদি পরিমাপ করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণ কমাতে বা বাড়াতে হবে।
- সঠিকভাবে আলো প্রদান করতে হবে।

২০১৫

- কোনরূপ রোগ লক্ষণ প্রকাশের সাথে সাথেই নিকটস্থ পশু চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা

- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভজনক খামারের পূর্বশর্ত। তাই খামারের ভেতরে ও বাইরের চারদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য। মেঝে বা লিটার পদ্ধতির ঘরের ক্ষেত্রে প্রতি ব্যাচে নতুন লিটার দেয়া ও ঘর সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা উচিত।
- খামারের সকল যন্ত্রপাতি, যেমন- মুরগির খাঁচা, ডিম রাখার পাত্র, খাদ্য পাত্র ও পানি পাত্র ইত্যাদি নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- বছরে অন্তত একবার শেডসহ সকল যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুতে হবে অথবা ফিউমিগেশন করে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- খামারে ব্যবহৃত পুরোনো লিটার যথাসম্ভব নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিতে হবে। অপসারণকালে ব্যবহৃত লিটার দ্বারা কোনভাবেই যেন খামারের পরিবেশ নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।
- সমস্ত ঘর ঝাড়ু দিতে হবে। খামারের প্রতিটি অংশ, যেমন- মেঝে, বৈদ্যুতিক পাখা, বাল্বসহ অন্যান্য সরঞ্জাম, দরজা জানালার মাঝে থাকা ধুলাবালি, মাকড়সার জাল প্রভৃতি পরিষ্কার করতে হবে। নষ্ট বাল্বের জায়গায় নতুন বাল্ব লাগাতে হবে।
- শেডের ভেতরে জীবাণুনাশক স্প্রে করলে ঘরের পিছন দিকে স্প্রে করা শুরু করে সামনের দিকে এসে শেষ করা উচিত। ঘরের ভেতরে প্রথমে ছাদ, পরে দেয়াল এবং সবশেষে মেঝেতে স্প্রে করতে হবে।
- শুকনো মেঝেতে অন্তত চার ইঞ্চি পুরু শুষ্ক শোষণক্ষম লিটার বিছিয়ে দিতে হবে। লিটার হিসাবে ধানের তুষ সর্বোত্তম।
- লিটারে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হলে কীটনাশক নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। কীটনাশক ও জীবাণুনাশক একত্রে ব্যবহার করা যাবে না। প্রয়োজনে কীটনাশক দেয়ালে স্প্রে করা যেতে পারে।
- ঘরের চারপাশে পর্দা হিসাবে পলিথিন বা নাইলনের বস্তা ব্যবহার না করে চটের বস্তা ব্যবহার করা উচিত। খাঁচা পদ্ধতির ঘরের ক্ষেত্রে প্রতি ব্যাচ বাড়ন্ত হাঁস পালন শেষে সমস্ত ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা অতীব জরুরি। লেয়ারের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফ্লক উঠানোর পূর্বে সমস্ত ঘর ও যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত।



চিত্রঃ ১.২৬ হাঁসের খামারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থা বজায় রাখা

৬.স্বাস্থ্য সম্মত ও আদর্শ খাদ্য প্রদান

বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া (যেমন- সালমোনেলোসিস) ও ছত্রাকজনিত (যেমন- এসপারজিলোসিস, আফলা টক্সিকোসিস) রোগের জীবাণু খামারের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। সত্যিকারের ভালো খাবার বলতে জীবাণুমুক্ত ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের সমন্বয়ে গঠিত খাদ্যকে বুঝায়।

৭. হাঁসের ঘরের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস ধ্বংসকারী জীবাণুনাশক অপেক্ষাকৃত উষ্ণ তাপমাত্রাতেই বেশি কার্যকর। তাপমাত্রা ৭০ ডিগ্রি ফারেনহাইট এর উপরে এবং আর্দ্রতা ৭৫% এর উপরে থাকলে ফরমালডিহাইড সবচেয়ে কার্যকর।
ক) ক্লোরক্স (সোডিয়াম হাইপো ক্লোরাইড দ্রবণ): ১ কন্টেইনার ক্লোরক্স দিয়ে ৮০ লিটার জীবাণুনাশক দ্রবণ তৈরি করা যায়। বাঁশের তৈরি হাঁসের ঘরের মেঝে, চালা ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত করার জন্য ক্লোরক্স খুবই কার্যকরী।
খ) ভায়োডিন (আয়োডিন দ্রবণ) : ১ বোতল ভায়োডিন ১০% সলিউশন দিয়ে ৫ লিটার জীবাণুনাশক দ্রবণ তৈরি করা যায়।
গ) চুন দিয়ে মাচার নিচের মাটি জীবাণুমুক্ত করা খুবই জরুরি। ১০০-২০০ হাঁস পালন উপযোগী একটি ঘরের মাঁচার নিচের মাটি জীবাণুমুক্ত করার জন্য ২০ কেজি পাউডার চুন ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশাতে হবে।

৮. বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং পানি পাত্রের সঠিক ব্যবস্থাপনা

- পান করার জন্য হাঁসের খামারে টিউবওয়েলের পানি অথবা বাতাস দূষিত নয় এমন এলাকার সঠিক উপায়ে রাখা বৃষ্টির পানি অথবা পৌর কর্তৃপক্ষ সরবরাহকৃত পানি অথবা ছাঁকা অথবা ১০০ লিটার

পানির সাথে অন্তত ৩০০ মি. গ্রা. ক্লোরিন পাউডার মিশ্রিত করে ৩-৬ ঘণ্টা সংরক্ষণ করার পর সেই পানি সরবরাহ করা উচিত।

- শেডে হাঁস থাকা অবস্থায় সপ্তাহে একবার বেকিং সোডা (সোডিয়াম বাই কার্বনেট) প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে ড্রিংকার, বাল্ব ও পাইপ লাইনে আঠালো বস্তু জমতে পারবে না। পানির সাথে অ্যান্টিবায়োটিক বা ভিটামিন দেয়ার ঠিক পূর্বেই বেকিং সোডা মিশ্রিত পানি পরিচালনা করতে হবে। প্রতি গ্যালন মজুদ দ্রবণের সাথে এক টেবিল চামচ বেকিং সোডা দিতে হবে।
- লিটার পদ্ধতিতে হাঁস পালনে পানি সরবরাহের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. নতুন ব্যাচের ব্যবস্থাপনা

পুনরায় হাঁস বা বাচ্চা তোলার পূর্বে ঘর এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপযোগী হয়েছে কিনা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন-

- সমস্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ পরীক্ষা করতে হবে। মেরামতের প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা করতে হবে।
- হাঁসের খাঁচা, খাদ্য পাত্র, পানি পাত্র, মেঝে, দেয়াল ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হবে। ভালোভাবে পরিষ্কার করার জন্য উচ্চ চাপযুক্ত পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- পানি পাত্র ও সরবরাহ লাইন প্রয়োজনে মেরামত করতে হবে।
- থার্মোমিটার, থার্মোস্ট্যাট, গ্যাস ব্রুডার, স্টোভ ইত্যাদি ব্যবহার উপযোগী করতে হবে।
- আগের ব্যাচের হাঁসের বিষ্ঠাগুলি পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা জীবাণুমুক্ত করতে হবে অথবা কম্পোস্ট বা জৈব সার তৈরির কাজে লাগাতে হবে।
- হাঁসের খাঁচা, খাদ্যপাত্র, পানি পাত্র, মেঝে, দেয়াল ইত্যাদি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।
- টিন, লোহা বা তামার তৈরি দ্রব্যসমূহ জীবাণুনাশক দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পর ধৌত করে ফেলতে হবে।
- দ্রব্যসমূহ ভালোভাবে শুকানোর পর নতুন বাচ্চা তুলতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- জীব নিরাপত্তা বা বায়ো সিকিউরিটির উদ্দেশ্য লেখো।
- হাঁসের খামারের স্থান নির্বাচনের জন্য কোন বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হয়?
- কোন কোন উৎস হতে হাঁসের খামারে রোগ জীবাণু প্রবেশ করতে পারে?
- খামারে টিকা প্রদানের সময় কী কী বিষয় মেনে চলতে হয়?

অনুসন্ধানমূলক কাজ

তোমার প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি যে কোন একটি হাঁসের খামার পরিদর্শন করো। খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও জীব নিরাপত্তার উপর মতামত দাও।

খামারের নাম	
ঠিকানা	
বাচ্চা হাঁসের সংখ্যা	
বাড়ন্ত হাঁসের সংখ্যা	
ডিমপাড়া হাঁসের সংখ্যা	
মাংসজাত হাঁসের সংখ্যা	
ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির নাম	১. ২. ৩. ৪. ৫.
ব্যবহৃত উপকরণের নাম	১. ২. ৩. ৪. ৫.
গৃহীত জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা	১. ২. ৩. ৪. ৫.
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
শ্রেণি শিক্ষকের নাম	
বি:দ্র: ছকটি পূরণ করে তোমার শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দাও	

জব ১ : হাঁসের ঘরে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ স্থাপন

পারদর্শিতার মানদণ্ডঃ
- হাঁস পালনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি চিহ্নিত করা
- হাঁস পালনের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করা
- হাঁস পালনের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতির স্থাপন কৌশল সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	১টি
২	রাবার হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
৩	সেফটি গগলস	মাঝারি মাপের	১টি
৪	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৫	হেড কভার	মাঝারি মাপের	১টি
৬	গামবুট	শিক্ষার্থীর পায়ের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া



চিত্রঃ অ্যাপ্রন



চিত্রঃ রাবার হ্যান্ড গ্লোভস



চিত্র: সেফটি গগলস



চিত্র: মাস্ক



চিত্র: হেড কভার



চিত্র: গামবুট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ব্রুডার	মাঝারি মাপের	১টি
২	থার্মোমিটার	মাঝারি মাপের	১ টি
৩	হাইগ্রোমিটার	মাঝারি মাপের	১টি
৪	চিকগার্ড	১০ফুট ব্যাসের	১টি
৫	খাদ্য পাত্র	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	২০টি
৬	পানি পাত্র	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	১০টি
৭	স্প্রে মেশিন	মাঝারি মাপের	১টি
৮	নিক্তি	মাঝারি মাপের	১টি

২০২৫



চিত্র: থার্মোমিটার



চিত্র: হাইগ্রোমিটার



চিত্র: স্প্রে মেশিন



চিত্র: নিক্তি



চিত্র: খাদ্য পাত্র



চিত্র: পানি পাত্র

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials)

ক্রমিক নং	কাঁচামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	হাঁসের বাচ্চা	১দিন বয়সের	৩০০টি
২	লিটার	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	১৫ বস্তা
৩	জীবাণুনাশক	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	২ টি
৪	টিকাবীজ	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	৬টি
৫	সিরিঞ্জ	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	১টি
৬	নিডিল	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	২০টি
৭	চট	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	১০টি
৮	বেলচা	টিন ও কাঠের তৈরি	১টি
৯	খবরের কাগজ	পেপার	২কেজি
১০	হার্ডবোর্ড	মাঝারি দামের	২টি



চিত্র: কোদাল



চিত্র: হার্ডবোর্ড



চিত্র: জীবাণুনাশক স্প্রে



চিত্র: বেলচা

সাফল্যজনকভাবে হাঁস পালন করতে হাঁসের ঘরের বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে খাদ্যপাত্র, পানি পাত্র, থার্মোমিটার, ব্রুডার, ফ্যান, বাল্ব ইত্যাদি হাঁসের সংখ্যা অনুসারে সঠিক সংখ্যায় উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা হয়, যাতে ঘরের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত থাকে।

কাজের ধারাঃ

১) সহজে আলো বাতাস চলাচল করতে পারে এমন একটি ঘর নির্বাচন করো।

২) ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্ত করে নাও।

৩) মেঝেতে লিটার স্থাপন করো।

৪) বাচ্চার সংখ্যা অনুসারে মেঝেতে ব্রুডার স্থাপন করো।

৫) ব্রুডারের চারদিকে ঘিরে চিকগার্ড স্থাপন করো।

৬) ব্রুডার গার্ডের কেন্দ্রস্থলে ঘরের সিলিংয়ের সাথে হোভার ঝোলাতে হবে। ব্রুডার গার্ড ও হোভারের দূরত্ব হবে ২-৩ ফুট।

৭) হোভারের সাথে ব্রুডার হিটার (বাল্ব, গ্যাস, বার্নার ইত্যাদি) সংযুক্ত কর। ৩০০ বাচ্চার জন্য ১০০ ওয়াটের তিনটি বাল্ব স্থাপন করো।

৮) হোভারের নিচে লিটারের উপর খবরের কাগজ বিছাও।

৯) খবরের কাগজের উপর প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য পাত্র ও পানি পাত্র স্থাপন করো।



চিত্র : হাঁসের ঘরে যন্ত্রপাতিসহ ব্রুডার স্থাপন

১০) খাদ্য পাত্র হাঁসের পিঠ সমান উচ্চতায় স্থাপন করো।

১১) পানি পাত্র এমনভাবে স্থাপন কর যেন হাঁস এর নিচ দিয়ে সহজে যাতায়াত করতে পারে। অর্থাৎ গলা সমান উচ্চতায় ঝুলিয়ে দাও।

২০১৫

১২) হাঁসের বুক সমান উচ্চতায় থার্মোমিটার ঝুলিয়ে দাও।

১৩) খোলামেলা ঘরের সমস্ত ফাঁকা স্থান পর্দা দ্বারা ঢেকে দাও।

সাবধানতাঃ

১)"Safety First" কথাটি সবসময় মাথায় রাখতে হবে।

২) চিকগার্ড গোলাকার করে স্থাপন করতে হবে।

৩) সাবধানে যন্ত্রপাতি ব্যবহার কর যেন নষ্ট না হয়।

৪) হাঁসের সংখ্যা ও বয়স অনুসারে খাদ্য পাত্র ও পানি পাত্র স্থাপন করতে হবে।

জব ২: হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং

পারদর্শিতার মানদণ্ডঃ

- বাচ্চাকে ব্রুডিং করার জন্য কক্ষ প্রস্তুত করা
- ব্রুডার ঘরে যন্ত্রপাতি স্থাপন নিশ্চিত করা
- বয়স অনুযায়ী তাপমাত্রা, টিকা প্রদান ও ঔষধ প্রয়োগ নিশ্চিত করা
- বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা বুঝে সঠিক পদক্ষেপ নিশ্চিত করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	১টি
২	রাবার হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
৩	সেফটি গগলস	মাঝারি মাপের	১টি
৪	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৫	হেড কভার	মাঝারি মাপের	১টি
৬	গামবুট	শিক্ষার্থীর পায়ের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া



চিত্র: অ্যাপ্রন



চিত্র: রাবার হ্যান্ড গ্লোভস



চিত্র: সেফটি গগলস



চিত্র: মাস্ক



চিত্র: হেড কভার



চিত্র: গামবুট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ব্রুডার	মাঝারি মাপের	১টি
২	থার্মোমিটার	মাঝারি মাপের	১ টি
৩	হাইগ্রোমিটার	মাঝারি মাপের	১টি
৪	চিকগার্ড	১০ফুট ব্যাসের	১টি
৫	খাবার পাত্র	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	২০টি
৬	পানি পাত্র	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	১০টি
৭	স্প্রে মেশিন	মাঝারি মাপের	১টি
৮	নিক্তি	মাঝারি মাপের	১টি



চিত্র: স্প্রে মেশিন


চিত্র: নিক্তি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials)

ক্রমিক নং	কাঁচামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	হাঁসের বাচ্চা	১দিন বয়সের	৩০০টি
২	লিটার	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	১৫ বস্তা
৩	জীবাণুনাশক	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	১ টি
৪	টিকাবীজ	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	১টি
৫	সিরিঞ্জ	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	১টি
৬	নিডিল	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	২০টি
৭	চট	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	১০টি
৮	বেলচা	টিন ও কাঠের তৈরি	১টি
৯	খবরের কাগজ	পেপার	২কেজি
১০	হার্ডবোর্ড	মাঝারি দামের	২টি

২০২৬



চিত্র: একদিন বয়সের হাঁসের বাচ্চা



চিত্র: টিকাবীজ



চিত্র: সিরিঞ্জ ও নিডিল



চিত্র: বেলচা

কাজের ধারা

ক) সহজে আলো বাতাস চলাচল করতে পারে এমন একটি ঘর নির্বাচন করো।

খ) ঘরটি ভালভাবে পরিষ্কার করো।

গ) জীবাণুনাশক দিয়ে ঘরটি ভালভাবে জীবানুমুক্ত করো।

ঘ) ঘরটি শুকানোর পর মেঝোতে শুষ্ক লিটার ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে বিছিয়ে দাও।

ঙ) ঘরটির সুবিধাজনক স্থানে একটি ব্রুডার স্থাপন করো।

চ) বাচ্চার সংখ্যানুসারে ব্রুডারের চতুর্দিকে প্রয়োজনীয় দূরত্বে চিকগার্ড স্থাপন করো।

ছ) চিকগার্ডের ভেতরে লিটারের উপর পেপার বিছিয়ে দাও।

জ) পেপারের উপর প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার পাত্র ও পানি পাত্র স্থাপন করো।



চিত্রঃ ব্রুডার ঘরে খাদ্য পাত্র ও পানি পাত্র স্থাপন

ঝ) থার্মোমিটার ও হাইগ্রোমিটার বাচ্চার গলার সমান উচ্চতায় ঝুলিয়ে দাও।

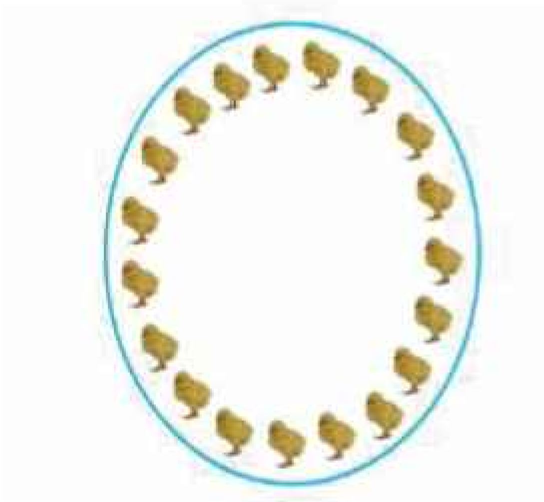
ঞ) বাচ্চা ছাড়ার ১২ ঘন্টা পূর্বে ব্রুডার চালু করে থার্মোমিটার ও হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা পরিমাপ করো।

ট) প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা উঠলে চিকগার্ডের ভেতরে একদিনের বাচ্চা ছেড়ে দাও।

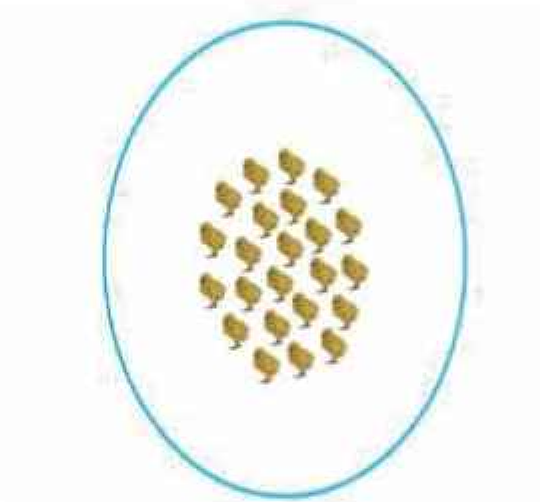
ব্রুডিং পিরিয়ডে বিভিন্ন বয়সে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা নিম্নরূপ

বয়স (সপ্তাহ)	প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা	
	ডিগ্রি ফারেনহাইট	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
প্রথম	৯৫	৩৫
দ্বিতীয়	৯০	৩২.২
তৃতীয়	৮৫	২৯.৪
চতুর্থ	৮০	২৬.৬
পঞ্চম	৭৫	২৩.৮
ষষ্ঠ	৭০	২১.১

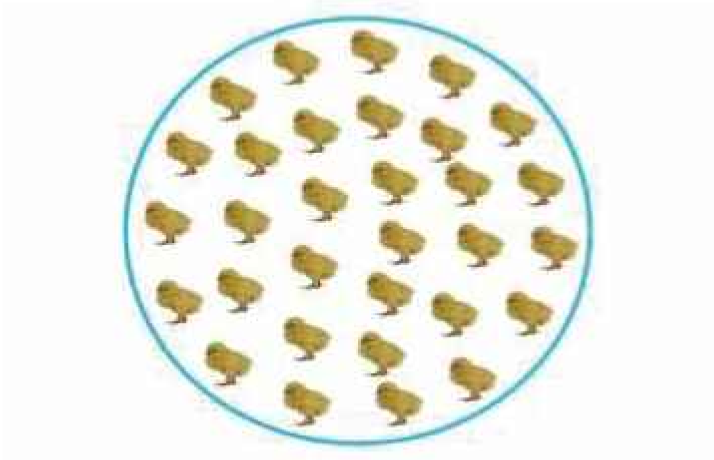
ব্রুডিংকালে তাপমাত্রা কম বেশি হলে বাচ্চার অবস্থান নিম্নরূপ লক্ষ্য করা যায়। এরকম হলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করো।



চিত্র: বেশী তাপমাত্রায় ব্রুডারে বাচ্চার অবস্থান



চিত্র: কম তাপমাত্রায় ব্রুডারে বাচ্চার অবস্থান



চিত্র: সঠিক তাপমাত্রায় ব্রুডারে বাচ্চার অবস্থান

ঠ) ব্রুডিংকালে বাচ্চাকে তালিকা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ষ্টার্টার রেশন ও বিশুদ্ধ পানি পরিবেশন করো।

ড) নির্ধারিত তালিকা মোতাবেক ঔষধপত্র ও টিকা প্রদান করো।

ঢ) বাচ্চা অসুস্থ হলে প্রয়োজোনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা নাও ।

ণ) বাচ্চার বৃদ্ধি যথাযথ কি না তা খেয়াল রাখ এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করো।

ত) বাচ্চা বড় হলে প্রয়োজন অনুসারে চিকগার্ডের দুরত্ব বাড়িয়ে দাও এবং পাঁচ সপ্তাহ পর ব্রুডার এবং চিকগার্ড সরিয়ে ফেলো।

থ) এরপর বাচ্চাকে গ্রোয়ার শেডে স্থানান্তর করো।

দ) সকল তথ্য রেকর্ড শীট ও রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করো।



চিত্রঃ হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং

সতর্কতাঃ
১) লিটার ভিজে গেলে দ্রুত সরিয়ে নতুন লিটার দিতে হবে।
২) পানি পাত্র প্রতিদিন জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
৩) টিকাদান কর্মসূচী সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

জব ০৩: হাঁসের ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্তকরণের দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ডঃ
- হাঁসের ঘর ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- জীবাণুনাশক মিশ্রণের দক্ষতা অর্জন করা
- জীবাণুনাশক প্রয়োগ করে ঘর জীবাণুমুক্ত করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	১টি
২	রাবার হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
৩	সেফটি গগলস	মাঝারি মাপের	১টি
৪	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৫	হেড কভার	মাঝারি মাপের	১টি
৬	গামবুট	শিক্ষার্থীর পায়ের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	স্প্রে মেশিন	মাঝারি মাপের	১টি
২	নিক্তি	মাঝারি মাপের	১টি
৩	বালতি	মাঝারি মাপের	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials)

ক্রমিক নং	কাঁচামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	জীবাণুনাশক	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	১ টি
২	বেলচা	টিন ও কাঠের তৈরি	১টি
৩	ঝাড়ু	বাশের	১টি
৪	পানি	বিশুদ্ধ	প্রয়োজনমত
৫	হোস পাইপ	প্লাস্টিকের	৩০ ফুট



চিত্রঃ বালতি



চিত্রঃ ঝাড়ু

কাজের ধারাঃ

১) বিশ্বস্থ উৎস হতে জীবাণুনাশক সংগ্রহ করো।

২) নিরাপত্তামূলক পোষাক (পিপিই) পরিধান করে নাও।


সাবান



স্যাভলন


ডেটল

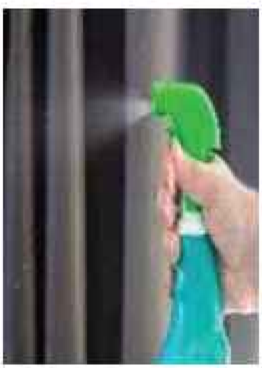

হ্যান্ড ওয়াশ



ক্লিনার



ক্লোরক্স


স্প্রেয়ার



হেক্সিসল



অ্যালকোহল

চিত্র: বিভিন্ন ধরনের জীবাণুনাশক

৩) ঘরটি ঝাড়ু দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নাও।

৪) নির্দেশিত পরিমান পানি একটি বালতিতে নাও।

৫) নির্দেশিত মাত্রায় জীবাণুনাশক ঐ পানিতে মেশাও।

৬) মিশ্রণটি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করো।

২০২৫

৭) তারপর জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি স্প্রে মেশিনে তোলো।

৮) এবার ঘরের মেঝে এবং দেয়ালে জীবাণুনাশক স্প্রে করো।



চিত্র: হাঁসের খামার জীবাণুমুক্তকরণ করা হচ্ছে

সতর্কতা

১) জীবাণুনাশক অবশ্যই মাত্রা মোতাবেক মিশাতে হবে।

২) জীবাণুনাশক যেন শরীরে না লাগে ও নিশ্বাসে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কয়টি পদ্ধতিতে হাঁস পালন করা হয়?

২. রেঞ্জ বা রান কী?

৩. কয়েকটি জীবাণুনাশকের নাম লেখো।

৪. ব্রুডিং কী?

৫. লেন্টিং পদ্ধতিতে প্রতিটি ফ্লকে কতটি হাঁস থাকে?

৬. ১ম সপ্তাহে ব্রুডার ঘরের তাপমাত্রা কত ডিগ্রি রাখতে হবে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. লেন্টিং পদ্ধতির সুবিধাসমূহ লেখো।

২. মেঝেতে হাঁস পালনের সুবিধাগুলো লেখো।

৩. বয়স অনুযায়ী ব্রুডার ঘরের তাপমাত্রা লেখো।

৪. "অল ইন অল আউট" পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখো।

৫. ব্রুডিং কেন করা হয়?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. হাঁস পালনের পদ্ধতিগুলো আলোচনা করো।

২. থার্মোমিটার ছাড়া ব্রুডার ঘরে স্বাভাবিক তাপমাত্রা আছে কি না কীভাবে তা বোঝা যায় বর্ণনা করো।

৩. বাচ্চা উঠানোর আগে ব্রুডার ঘর প্রস্তুতকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখো।

৪. হাঁসের ঘর জীবাণুমুক্ত করার ধাপগুলো আলোচনা করো।

৫. বাসস্থান এবং এর পারিপার্শ্বিকের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার কৌশল লেখো।

২০২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাঁসের খাদ্য

Duck Feed





মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মতো হাঁসেরও খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। জীবন ধারনের জন্য খাদ্য অপরিহার্য। শরীরের প্রয়োজনীয় তাপ শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যা হাঁসকে খাওয়ানো হয় তাই খাদ্য। হাঁসকে যে সব খাবার খেতে দেয়া হয় সেগুলো পরিবর্তিত হয়ে ডিম ও মাংস তৈরি হয়। সুতরাং অধিক ডিম ও মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে হাঁসকে সুষম খাদ্য খেতে দিতে হয়। আধুনিক বাণিজ্যিক হাঁসের খামারের মোট খরচের প্রায় ৭০% খাদ্য খরচ হয়। তাই একজন হাঁসের খামারের মালিক তিনি যত ছোট বা বড় খামারই পরিচালনা করুন না কেন হাঁসের খাদ্য সম্পর্কে তার একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- হাঁসের খাদ্য উপকরণসমূহ সনাক্ত করতে পারবো;
- বাড়ন্ত হাঁসের জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুত করতে পারবো;
- ডিম পাড়া হাঁসের জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুত করতে পারবো;
- মাংসজাত হাঁসের জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুত করতে পারবো;
- হাঁসের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে পারবো।

২.১ হাঁসকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্য-

- হাঁস পালন করে অধিক ডিম ও মাংস পেতে হলে হাঁসকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- হাঁসের খামার পরিচালনা করে আত্মকর্মসংস্থান করা যায়।
- জাতিকে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াতে হলে মাংস ও ডিম উৎপাদন করা প্রয়োজন। পুষ্টিকর খাদ্যই মানুষকে কর্মঠ করতে পারে। আর কর্মঠ মানুষই নিজের ভাগ্য ও জাতীয় উন্নয়ন আনয়ন করতে পারে।
- হাঁস মানুষের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা দিতে পারে যদি মানুষ হাঁসকে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করতে পারে।
- উভয় প্রাণিই পুষ্টিকর খাদ্য চায়, তবে পার্থক্য হচ্ছে মানুষ যা খেতে পারে না তা হাঁস খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং মানুষের জন্য উৎকৃষ্ট আমিষ উৎপাদন করে।

২.২ সুষম খাদ্য

যে সব খাদ্য মিশ্রণে হাঁসের দৈহিক প্রয়োজন মিটানো ও উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ও সঠিক অনুপাতে সব পুষ্টি উপাদান থাকে সেই খাদ্য মিশ্রণকে সুষম খাদ্য বলা হয়।

সুষম খাদ্যের সুফল-

- পরিমানমত খাদ্য গ্রহণ করে।
- শারীরিক বৃদ্ধি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হয়ে থাকে।
- মাংস বৃদ্ধি ঘটে।
- ডিম পাড়ার সংখ্যা বেড়ে যায়।
- ডিমের আকার বড় হয়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

সুষম খাদ্যের বৈশিষ্ট্য-

- একটি হাঁসের বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি থাকতে হবে।
- সুষম খাদ্যে সাধারণত গড়ে ৫০-৬০% শর্করা, ২০% আমিষ এবং ১৫-২৬% চর্বি থাকতে হবে।
- পৌষ্টিক নালীর পেরিস্টলিক ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও ছোবড়া ভুষি অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

- সুষম খাদ্যে অবশ্যই খনিজ পদার্থ যেমন; ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, জিংক, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম থাকতে হবে।
- সুষম খাদ্যে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণে পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- সুষম খাদ্য অবশ্যই সহজপ্রাচ্য হতে হবে।
- সুষম খাদ্য উপাদান সহজলভ্য ও আনুপাতিক হারে সস্তা হতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- খাদ্য কাকে বলে?
- হাঁসকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্য লেখো।
- সুষম খাদ্যের সুফল লেখো।
- সুষম খাদ্যের বৈশিষ্ট্য লেখো।

২.৩ খাদ্য উপাদানের কার্যাবলি

অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদান ৬ (ছয়) টি যথা :

১) শর্করা বা শ্বেতসার

২) আমিষ বা প্রোটিন

৩) স্নেহ বা চর্বি

৪) খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন

৫) খনিজ পদার্থ ও

৬) পানি।

শর্করা জাতীয় খাদ্য উপকরণের কাজ-

- হাঁসকে যে সকল খাদ্য খেতে দেওয়া হয় তার প্রায় ৫০-৬০ ভাগই শর্করা। এটা দেহের সর্বাধিক শক্তির চাহিদা পূরণে সক্ষম।
- শর্করা জাতীয় খাদ্য অন্ত্রের বিচলনের মাধ্যমে কোষ্ঠ কাঠিন্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।
- শর্করা জাতীয় খাদ্য জারিত হয়ে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে যা সজীব বস্তুর জৈবিক ক্রিয়া সম্পাদনে প্রয়োজন।
- যকৃত ও পেশীতে শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্লাইকোজেন হিসেবে সঞ্চিত থাকে যা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

চর্বি বা তেল জাতীয় খাদ্য উপকরণের কাজ-

- হাঁসকে যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তাতে ১৫-২৫ ভাগই চর্বি বা তৈল জাতীয় পদার্থ।
- তৈল বা চর্বি জাতীয় খাদ্য উপাদানের সাথে ভিটামিন এবং অপরিহার্য তৈল/চর্বি জাতীয় পদার্থ গৃহীত হয়ে শরীর বৃদ্ধির কাজে অংশ নেয়।
- এ সব উপাদানে এ, ডি, ই, কে (Vitamin- A, D, E, K) জাতীয় ভিটামিন দ্রবীভূত থাকতে পারে।
- হাঁসের বিভিন্ন অংগে বিশেষত চামড়ার নিচে চর্বি জাতীয় খাদ্য সঞ্চিত থাকে যা প্রয়োজনে খাদ্যের অভাব পূরণ এবং দেহের ক্ষুধা নিবারণ করে।
- দেহের কর্মশক্তি ও উত্তাপশক্তি বৃদ্ধি করাই চর্বির প্রধান কাজ।

আমিষ জাতীয় খাদ্য উপকরণের কাজ-

হাঁসের খাদ্যের শতকরা ১৮-২২ ভাগ আমিষ।

- আমিষ বা প্রোটিন প্রোটোপ্লাজমের অন্যতম উপাদান।
- দেহের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করা আমিষের প্রধান কাজ।
- আমিষ ডিম ও মাংস উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
- পেপসিন, ট্রিপসিন প্রভৃতি জারক রস নি:সরণের জন্য আমিষ অপরিহার্য।
- আমিষ অপরিহার্য এমাইনো এসিডের চাহিদা পূরণ করে।
- রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।
- নিউক্লিও প্রোটিনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

খাদ্যপ্রাণ/ভিটামিন জাতীয় খাদ্য উপকরণের কাজ-

ভিটামিন এমন এক বিশেষ ধরনের জৈব যৌগ যা প্রাণীদেহে খুবই অল্প পরিমানে প্রয়োজন কিন্তু এর অভাবে দেহের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে। এরা বিপাকীয় কার্যাবলীতে জৈব প্রভাবক এর ভূমিকা পালন করে।

হাঁসের দেহের প্রয়োজনীয় কয়েকটি খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিনের নাম, উৎস ও প্রয়োজনীয় কার্যাবলী দেওয়া হলো-

ভিটামিনের নাম	প্রধান উৎসসমূহ	শরীর বৃদ্ধির কার্যাবলী
ভিটামিন এ (রেটিনল)	মাছের যকৃতের তৈল, দুধ, মাখন, ডিম, সবজি, ভুট্টা, ফিসমিল	রোগ প্রতিরোধক, চক্ষু রোগ নিবারক, পুষ্টি সহায়ক
ভিটামিন ডি (ক্যালসিফেরল)	মাছের যকৃতের তৈল, দুধ, মাখন, ডিম, সবজি, ভুট্টা, ফিসমিল	অস্থি ও ডিমের খোসা তৈরিতে প্রয়োজন
ভিটামিন ই (টোকোফেরল)	মাংস, ডিম, সবজি, অঙ্কুরিত ছোলা	পালকের বৃদ্ধি ও প্রজননে সহায়তা করে
ভিটামিন কে (ফাইলোকুইনন)	শুটকি মাছ, শাক সবজি	রক্ত জমাট বাধায়
ভিটামিন সি (অ্যাসকরবিক এসিড)	লেবু জাতীয় ফল, টমেটো, শাক সবজি	রক্তনালীর প্রাচীর শক্ত করে
ভিটামিন বি-১ (থায়ামিন)	ইস্ট, চালের কুড়া, যকৃত, ডিম, দুধ,	দৈহিক বৃদ্ধির সহায়ক

২০২৫

	শাক সবজি	
ভিটামিন বি-২ (রিবোফ্লেবিন)	ইস্ট, চালের কুড়া, যকৃত, ডিম, দুধ, শাক সবজি	দৈহিক বৃদ্ধির সহায়ক
ভিটামিন বি-৩ (নিয়াসিন)	চাল, আলু, ভুট্টা, শাক সবজি	দৈহিক বৃদ্ধির সহায়ক
ভিটামিন বি-৫ (প্যান্টোথেনিক এসিড)	ইস্ট, চালের কুড়া, যকৃত, ডিম, দুধ, শাক সবজি	দৈহিক বৃদ্ধির সহায়ক
ভিটামিন বি-৬ (পাইরিডক্সিন)	চাউল, গম, ভুট্টা, দুধ, যকৃত, ডিমের কুসুম, ইস্ট	দৈহিক বৃদ্ধির সহায়ক
ভিটামিন বি-৯ (ফলিক এসিড)	মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, যকৃত	দৈহিক বৃদ্ধির সহায়ক
ভিটামিন বি-১২ (সায়ানো কোবালামিন)	মাছের যকৃতের তৈল, দুধ, মাখন, ডিম, সবজি, ভুট্টা, ফিসমিল	রক্তকোষ সৃষ্টি করে, দৈহিক বৃদ্ধির সহায়ক

মিনারেল/খনিজ জাতীয় খাদ্য উপকরণের কাজ-

- প্রাণিদেহের রক্ত ও অন্যান্য তরল পদার্থের গঠনগত ধর্ম বজায় রাখে।
- প্রাণিদেহের অস্থি গঠনে সহায়তা করে।
- পালক, নখ তৈরিতে সহায়তা করে।
- ইনসুলিন নামক প্রাণরস গঠন করতে প্রয়োজন হয়।
- ইহা হাড় গঠনে সহায়তা করে।

পানির কাজ-

কোন জীবই পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না। তাই পানির অপর নাম জীবন। জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমে ৬৫-৯৫% পানি থাকে। হাঁসের খামারে সরবরাহকৃত পানির গুণগতমান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরবরাহকৃত পানি স্বাভাবিক তাপের ও স্বাদের, পরিষ্কার ও রোগ জীবাণুমুক্ত হতে হবে যাকে বিশুদ্ধ পানি বলে। পানির p^H ৫-৭ এর মধ্যে থাকা বাঞ্চনীয়।

- পানি পিপাসা নিবারণ করে।
- দেহকে সতেজ রাখে।
- দেহের তরল পদার্থের ভারসাম্য বজায় রাখে।
- বিভিন্ন খাদ্যবস্তু হজম ও শোষণে সাহায্য করে।
- দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
- দেহের তরল পদার্থের p^H এর মান নিয়ন্ত্রণ করে।
- খাদ্যবস্তু থেকে প্রাপ্ত পুষ্টিকণা দেহের কোষে পৌছাতে সাহায্য করে।
- জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
- পানি উত্তম দ্রাবক হিসেবে কাজ করে।

হাঁসের পানি গ্রহণের পরিমাণ প্রভাবিত করার বিষয়সমূহ

একটি হাঁস যে পরিমাণ খাবার গ্রহণ করে স্বাভাবিক নিয়মে এর দ্বিগুণ পানি গ্রহণ করে থাকে। যে সমস্ত বিষয় হাঁসের পানি গ্রহণকে প্রভাবিত করে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

- বেশি শক্তি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করলে বেশী পানি গ্রহণ করে থাকে।
- আমিষযুক্ত খাদ্য গ্রহণ যথা সয়াবিন, মাংস, শুটকি মাছ, হাঁড়ের গুড়া খেলে হাঁস পানি বেশী খায়।
- খাবারে আঁশ জাতীয় খাদ্য উপাদানের পরিমাণ বাড়লে পানির প্রয়োজনীয়তা বাড়ে।
- ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে আদর্শ তাপমাত্রা হিসেবে ধরা হয়। এই তাপমাত্রার উপরে প্রতি ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পানি গ্রহণের পরিমান ৭% বেড়ে যায়।
- পানির p^{H} ৫ এর নিচে নেমে গেলে বা ৭ এর বেশি বেড়ে গেলে পানি গ্রহণের পরিমাণ কমে যায়।
- পানি সরবরাহের পদ্ধতির উপরও পানি গ্রহণ অনেকাংশে নির্ভর করে। ট্রাফ সিস্টেমে প্রতিদিন ২৫০ মিলি পানি লাগে যেখানে নিপল ড্রিংকার পদ্ধতিতে ১৬৬ মিলি পানি লাগে।
- বয়সের কম বেশীর জন্য পানি গ্রহণ কম বেশী হতে পারে।
- উৎপাদনের উপর নির্ভর করে পানি গ্রহণ কম বেশী হতে পারে।
- তাপমাত্রা কমে গেলে পানি গ্রহণের পরিমাণ কমে যায়।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদান কয়টি ও কী কী?
- শর্করা জাতীয় খাদ্য উপকরণের ভূমিকা লেখো।
- আমিষ জাতীয় খাদ্য উপকরণের ভূমিকা লেখো।
- ভিটামিন জাতীয় খাদ্য উপকরণের ভূমিকা লেখো।

২.৪ হাঁসের বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ

হাঁস মুক্ত পদ্ধতিতে হাওড়-বাওড়, নদীনালা, খালবিল থেকে বিভিন্ন রকম উপকরণ খাদ্য হিসেবে খেয়ে থাকে। আবদ্ধ ও অর্ধ-আবদ্ধ অবস্থায় হাঁসকে বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের মাধ্যমে সুষম খাদ্য বা রেশন তৈরি করে খেতে দিতে হয়।

মুক্ত অবস্থায় যে সমস্ত খাদ্য উপকরণ প্রকৃতি থেকে পেয়ে থাকে সেগুলো হলো- ছোট শামুক, ঝিনুক, ছোট মাছ, আগাছা, ক্ষুদিপানা, বর্ষার শুরুতে বৃষ্টি শুরু হলে গর্ত থেকে বের হয়ে আসা ছোট ছোট কাঁকড়া, ধান কাটার মৌসুম শেষে ঝরে পড়া ধান ইত্যাদি।

যখন হাঁসগুলোকে সুষম খাদ্য তৈরি করে খাদ্য বা রেশন সরবরাহ করতে হয়, তখন যে সমস্ত খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলো নিম্নরূপ :

- গম গুড়া
- ভুট্টা গুড়া
- চালের কুঁড়া
- সয়াবিন মিল বা সয়াবিন বীজ সিদ্ধ
- তিলের খৈল বা বাদাম খৈল
- শুটকি মাছের গুঁড়া বা ঝিনুক বা শামুকের ভেতরের মাংস
- ঝিনুক চূর্ণ
- লবণ

এছাড়া প্রোটিনের উৎস হিসেবে প্রোটিন কনসেনট্রেট এবং ভিটামিন মিনারেলের উৎস হিসেবে ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স বাজারে পাওয়া যায় যা ক্রয় করে সুষম রেশনে ব্যবহার করা যায়।

খাদ্য উপাদান প্রাপ্তির উৎসসমূহ

খাদ্যের উপাদান	উৎস
শর্করা বা শ্বেতসার	গম, ভুট্টা, চাউলের গুঁড়া ইত্যাদি
আমিষ বা প্রোটিন	শুটকি মাছের গুঁড়া, শামুক বা ঝিনুকের ভেতরের মাংস, তিল ও বাদামের খৈল, সয়াবিন বীজ সিদ্ধ ইত্যাদি।
স্নেহ বা চর্বি	তিলের তৈল, সয়াবিন তৈল, সরিষার তৈল, সয়াবিন বীজ সিদ্ধ ইত্যাদি।
খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন	নানা রকম শাকসবজি, শার্ক লিভার তৈল, কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ভিটামিন।
খনিজ পদার্থ	লবণ, ঝিনুকের গুড়া, হাড়ের গুঁড়া, ডিমের খোসা, চুনা পাথর ইত্যাদি।
পানি	পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নির্দিষ্ট করতে হবে। যেমন: নলকুপ, অগভীর ও গভীর নলকুপের পানি।

চাল : চাল এবং চালের উপজাত দ্রব্যাদি হাঁসের জন্য সহজপাচ্য ও সহজলভ্য শর্করা জাতীয় খাবার। খুদ বা ভাঙা চালের মূল্য তুলনামুলকভাবে কম। তাই বাচ্চা হাঁস ও ডিমপাড়া হাঁসের জন্য খুদ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। খুদের মধ্যে আমিষ এবং ভিটামিন বি-২ থাকে। খুদে গড়ে ১০-১২% আমিষ, ১৩% চর্বি এবং ১১-১২% আঁশ থাকে।



চিত্রঃ ২.১ চাল

ভুট্টাঃ ভুট্টা সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হওয়ায় হাঁস বেশ পছন্দ করে। হাঁসের খাদ্য হিসেবে ভুট্টা খুবই জনপ্রিয়। হলুদ ভুট্টার মধ্যে ভিটামিন-এ এর পরিমাণ অধিক থাকে। ভুট্টা ছোট ছোট করে ভেঙে বা গুঁড়ো করেও হাঁসের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।



চিত্রঃ ২.২ ভুট্টা

গম : গমকে অনেকে হাঁসের আদর্শ খাদ্য বলে মনে করেন। গম সুস্বাদু এবং সহজপাচ্য। তদুপরি অন্যান্য দানাদার খাদ্যের তুলনায় আমিষের পরিমাণ অধিক। গমে সন্তোষজনক পরিমাণ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স থাকে। গম ভাঙা ও গমের ভুষি হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।



চিত্রঃ ২.৩ গম

যব : অন্যান্য দানা শস্যের সাথে মিশিয়ে যবকে হাঁসের খাদ্য হিসেবে দেয়া যায়। যবে আঁশের পরিমাণ অধিক। অতিরিক্ত যব খাওয়ালে হাঁসের চর্বির পরিমাণ বেড়ে যায়।



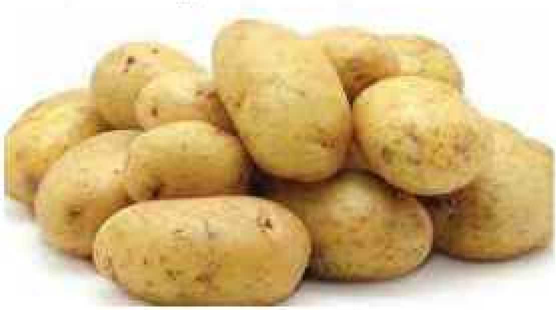
চিত্র: ২.৪ যব

জোয়ার: জোয়ারে ভুট্টার তুলনায় আমিষের পরিমাণ অধিক। জোয়ারের খোসা শক্ত বলে একে ভেঙ্গে গুড়ো করে দেয়া প্রয়োজন। একক ভাবে ব্যবহার না করে অন্যান্য খাদ্যের সাথে মিশিয়ে সরবরাহ করা উত্তম।



চিত্র: ২.৫ জোয়ার

গোল আলু: বাজারে আলুর যখন দাম কম থাকে তখন গমের বদলে আলু হাঁসের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এতে শর্করার পরিমান প্রায় ২০%। আলু সিদ্ধ করে দানাদার খাদ্যের সাথে অল্প পরিমাণে দেয়া যায়।



চিত্র: ২.৬ গোল আলু

শাকসবজি : বেগুন, মিষ্টি আলু, লাউ, কুমড়া এবং অন্যান্য সবজির খোসা ও অন্যান্য পরিত্যক্ত অংশ সিদ্ধ করে হাঁসকে খেতে দেয়া যায়। এসব খাদ্য ভিটামিন সমৃদ্ধ। বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, বীট, পালং শাক, পুঁইশাক, নটেশাক, মূলা প্রভৃতির পাতা কুঁচি কুঁচি করে কেটেও হাঁসকে খেতে দেয়া যায়। এসব খাদ্য ক্যারোটিন ও ভিটামিন সমৃদ্ধ।



চিত্র: ২.৭ শাকসবজি

চালের মিহি কুঁড়া : চালের কুঁড়া হাঁসের একটি উৎকৃষ্ট খাবার। এতে চালের গুঁড়া থাকার ফলে শর্করার পরিমাণ অধিক। কুঁড়া সহজপাচ্য। কুঁড়া খাওয়ানোর আগে দেখে নিতে হবে তা ভেজা বা ছত্রাক আক্রান্ত কি না।



চিত্র: ২.৮ চালের মিহি কুঁড়া

গমের ভুষি : গমের দানার মোটা অংশই ব্যবহৃত হয় ভুষি হিসেবে। গমের ভুষির মধ্যে গড়ে ১৬% আমিষ থাকে। গম ও ভুট্টার তুলনায় গমের ভুষির আমিষ উন্নতমানের। এতে নিয়াসিন ও থায়ামিনের পরিমাণ অধিক। ডিমপাড়া হাঁসের ক্ষেত্রে ১৫% গমের ভুষি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।



চিত্র: ২.৯ গমের ভুষি

ফিস মিল বা শুটকি মাছের গুঁড়া : মাছ এবং তার বর্জ্য পদার্থকে শুকিয়ে চূর্ণ করে অথবা অন্য কোনো উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে প্রাপ্ত দ্রব্যই ফিস মিল। এতে আমিষের পরিমাণ ৪৫-৫৫%। হাঁসের জন্য ফিস মিল একটি আদর্শ খাদ্য। বাচ্চা হাঁসে মাছের আঁশটে গন্ধ দূর করার জন্য অল্প পরিমাণে ফিস মিল ব্যবহার করতে হবে।



চিত্র: ২.১০ ফিস মিল

মিট মিল : মিট মিল হল শুকানো চূর্ণীকৃত মাংস বা মাংসের অংশ। এতে আমিষের পরিমাণ ৫০-৫৫%। মিট মিলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বিদ্যমান। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনও থাকে।



চিত্র: ২.১১ মিট মিল

কেঁচো মিল : কেঁচো থেকে তৈরি খাদ্যকেই বলা হয় কেঁচো মিল। ফিস মিল, মিট মিল, বোন মিল প্রভৃতির বিকল্প হিসেবে কেঁচো মিল ব্যবহার করা যায়। এতে অশোধিত আমিষের পরিমাণ ৫৯.৪৭%।



চিত্র: ২.১২ কেঁচো মিল

হাড়ের গুঁড়া ও মাংসের অবশিষ্টাংশ : খুর, শিং ও হাড় ব্যতিত প্রাণীর দেহের মাংসের অবশিষ্টাংশ শুকিয়ে ও গুঁড়ো করে এ খাদ্য পাওয়া যায়। এতে আমিষের পরিমাণ ৫৫%, খনিজ পদার্থের পরিমাণ ৪%। হাড়ের গুঁড়া ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সমৃদ্ধ। উত্তমরূপে পরিশোধন করার পর এগুলো হাঁসের খাদ্যের সাথে মেশানো হয়।



চিত্র: ২.১৩ হাড়ের গুঁড়া

রক্তের গুঁড়া বা ব্লাড মিল : কসাইখানা থেকে পশুর রক্ত সংগ্রহ করে তা শুকিয়ে চূর্ণ করা হয়। তবে এদেশে পর্যাপ্ত পশু রক্ত পাওয়া যায় না। এর মধ্যে আমিষের পরিমাণ প্রায় ৭৫-৮০%। এতে সামান্য পরিমাণে খনিজ পদার্থও থাকে। বাচ্চা হাঁসের খাদ্যে ব্লাড মিল দেয়া অনুচিত।



চিত্র: ২.১৪ রক্তের গুঁড়া

২০২৫

পোল্ট্রির শুকনা বিষ্ঠা : এতে অশোধিত আমিষ থাকার ফলে এটি চালের কুঁড়ার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ডিমপাড়া হাঁসের ক্ষেত্রে রেশনে যথাক্রমে ৫-১০% হারে এটি ব্যবহার করা যায়।



চিত্রঃ ২.১৫ পোল্ট্রির শুকনা বিষ্ঠা

সয়াবিন মিল : সয়াবিন ভালো করে সিদ্ধ করে শুকানোর পর গুড়ো করে বা তেল বের করে নেয়ার পর মিল হিসেবে মুরগিকে খাওয়ানো যায়। এতে প্রায় ৪৫% আমিষ ব্যতীত সামান্য পরিমাণে চর্বি ও পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন থাকে।



চিত্রঃ ২.১৬ সয়াবিন মিল

তিলের খৈল : এতে আমিষের পরিমাণ ৪০-৪৫% ও ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ২.৩%। তিলের খৈল হাঁসের জন্য একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। চীনা বাদামের খৈল ও তিলের খৈল অর্ধেক পরিমাণে মিশিয়ে হাঁসের খাদ্য তৈরি করা যায়।



চিত্রঃ ২.১৭ তিলের খৈল

সরিষার খৈল : সরিষা থেকে তেল নিষ্কাশনের পর যে অংশ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় সরিষার খৈল। এতে ৩৭-৪০% আমিষ, ০.৬% ক্যালসিয়াম এবং ১.০% ফসফরাস থাকে। বিশেষ স্বাদ ও সুগন্ধের কারণে হাঁস এ খৈল পছন্দ করে।



চিত্রঃ ২.১৮ সরিষার খৈল

চীনা বাদামের খৈল : চীনা বাদামের খৈল সুস্বাদু। অন্যান্য খাদ্যের সাথে চীনা বাদামের খৈল মিশিয়ে সুষম খাদ্য তৈরি করা যায়। এতে আমিষ ৪৬.৫%, চর্বি বা স্নেহ পদার্থ ৪%, ক্যালসিয়াম ০.২৮% এবং ফসফরাস ১.২৮% থাকে।

নারিকেলের খৈল : এ খৈলে আমিষের পরিমাণ ২০-২৫%। তবে বেশি দিনের পুরাতন খৈল হাঁসের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ কিছুদিন রেখে দিলেই খৈলে ছত্রাক জন্মায় এবং খাবারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

শামুক ও ঝিনুক খোসা: শামুক ও ঝিনুকের খোসা গুঁড়ো করে অন্যান্য খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়।। তবে এ খাদ্য সর্বোচ্চ ১-৩% হাঁসের খাদ্যের সাথে মেশানো উচিত। ঝিনুকের গুঁড়ায় ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ৩৭-৩৮%।



চিত্রঃ ২.১৯ শামুক ও ঝিনুক খোসা

চুনা পাথর : ক্যালসিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস হলো চুনা পাথর। হাঁসের খাদ্যে ২-৪% হারে ব্যবহার করা যায়। এতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ৩৮%। এটি হাঁসের হাড় গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



চিত্র: ২.২০ চুনা পাথর

বোন মিল : এটি একটি শুষ্ক খাদ্য। হাড়কে বায়ু চাপের উপস্থিতিতে বাষ্প ব্যবহার করে এটি তৈরি করা হয়। হাঁসের খাদ্যের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

সাধারণ খাদ্য লবণ : হাঁসের খাদ্যে অল্প পরিমাণে লবণ যোগ করা হলে হাঁসের দৈহিক বৃদ্ধি ও খাদ্য ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এটি সোডিয়াম ও ক্লোরাইডের প্রধান উৎস। তবে হাঁসের খাদ্যে অধিক মাত্রায় লবণ যোগ করা ঠিক নয়। খাবারের সাথে ০.৫% মাত্রায় লবণ যোগ করতে হয়। লবণ হাঁসের পানি গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তাছাড়া লবণ হাঁসের খাদ্যকে সুস্বাদু করে ও হজমে সাহায্য করে।



চিত্র: ২.২১ সাধারণ খাদ্য লবণ

অনুসন্ধানমূলক কাজ

তোমার প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি যে কোন একটি হাঁসের খামার পরিদর্শন করো। খামারে ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণগুলোর সাথে পরিচিত হও এবং সেগুলোতে কোন ধরনের পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায় তার তালিকা প্রস্তুত করে মতামত দাও। (একটি খাদ্য উপকরণের নামসহ বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো)

খামারের নাম:	
ঠিকানা:	
ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণের নাম	বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান
১. ভুট্টা	শর্করা
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	
৮.	
৯.	
১০.	
তোমার নাম :	
শ্রেণি :	
রোল :	
প্রতিষ্ঠানের নাম :	
শ্রেণি শিক্ষকের নাম :	
বিঃ দ্রঃ ছকটি পূরণ করে তোমার শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দাও	

২.৫ মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁসের খাদ্যাভ্যাস

এ পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক খাদ্যই হাঁসের খাদ্যের প্রধান উৎস। এরা পরিত্যক্ত শস্যকণা, জলজ আগাছা, ক্ষুদিপানা, পোকামাকড়, কচি সবুজ ঘাস, পাতা, ঝিনুক, শামুক, ছোট মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে ও বংশবিস্তার করে থাকে। তবে এসব হাঁসকে নিয়মিত অল্প পরিমাণে ধান বা গম, চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, রান্নাঘরের ও খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ সরবরাহ করা যায়। এরা বাড়ির আঙিনায় ও আশেপাশে চড়ে বেড়ায় এবং খাদ্য সংগ্রহ করে খায়।



চিত্র : ২.২২ মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁসের খাদ্য সংগ্রহ

হাওড়-বাওড় এলাকায় জলাশয়ে পানি থাকে বছরে সর্বোচ্চ ৮/৯ মাস। এই সময়ে কৃষকগণ হাঁসকে বাড়তি খাবার দেয় না। তারা হাঁসকে মুক্ত অবস্থায় সারাদিন জলাশয়ে ছেড়ে দেয়। জলাশয় থেকে হাঁস তাদের খাদ্য যেমন- শেওলা, শামুক, ঝিনুক, ছোট মাছ, আগাছা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি গ্রহণ করে তাদের খাবারের ৭০-৮০ শতাংশ চাহিদা মিটিয়ে থাকে। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে খামারিগণ শুধু কিছু পরিমাণ ধান, গম, কুঁড়া হাঁসকে খেতে দেয়। অনেকেরই হাঁসের সুষম খাদ্য তৈরি, খাওয়ানোর পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণাই নেই। তাই এসব হাঁসের ডিম উৎপাদন কমে যায়।



চিত্র : ২.২৩ পুকুরে হাঁসের খাদ্য সংগ্রহ

বিল ও হাওড়ের নিকটবর্তী খামারিগণ হাঁসগুলোকে বিল ও হাওড় হতে চড়িয়ে নিয়ে আসেন তখন সামান্য পরিমাণে খাদ্য ও পানি খেতে দিলে ভালো হয়। কারণ এই খাদ্য সারাদিন খাদ্য সংগ্রহ ও অন্বেষণের পর সন্ধ্যার সময় তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে উৎসাহিত করে।

চর এলাকায় বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন নিচু জলাশয়ে বা কর্দমাক্ত এলাকায় হাঁসগুলোকে নিয়ে খেতে দেয়া হয়। সেখান থেকে কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। ধান কাটার মৌসুম শেষ হলে তাদের মাঠে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, সেখান থেকে সারাদিন ঝরে পড়া ধান খুঁজে খুঁজে খায়। কমপক্ষে মাঠে ২-৩ মাস প্রচুর ধান থাকে যা খেয়ে হাঁস কোনো সুষম খাদ্য ছাড়াই প্রচুর ডিম দিতে পারে। মাঠের ঝরা ধান যখন ফুরিয়ে আসে তখন থেকে অল্প অল্প সুষম খাদ্য খাওয়ানো উচিত। এপ্রিলের দিকে বৃষ্টিপাত শুরু হলে ছোট কাঁকড়া গর্ত থেকে বের হয়ে আসে এবং সেখানে শামুক ঝিনুক পাওয়া যায়, তা হাঁস অন্বেষণ করে গ্রহণ করে এবং পরে বর্ষাকাল চলে আসে এবং ধান কাটার মৌসুম শুরু হওয়া পর্যন্ত কোনো সুষম খাদ্য ছাড়াই প্রচুর ডিম দিয়ে থাকে।

হাঁস মুক্ত পদ্ধতিতে জলাশয়ে চড়ে বিভিন্ন সময়ে খাদ্য উপকরণ সংগ্রহ করে গ্রহণ করাই হল হাঁসের খাদ্যাভ্যাস।

২.৬ হাঁসের বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান

সুষম খাদ্য প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণসমূহের পুষ্টিমানের শতকরা হার নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করা হল-

ক্রঃ নং	খাদ্য উপকরণের নাম	বিপাকীয় শক্তি (কিলো ক্যালোরি/ কেজি)	আমিষ (ক্রুড প্রোটিন) %	চর্বি (ক্রুড ফ্যাট) %	খনিজ পদার্থ (অ্যাশ) %	আঁশ (ক্রুড ফাইবার) %	মিথিওনিন %	লাইসিন %	সিসটিন %	ক্যালসিয়াম %	ফসফরাস %
১	গম	৩১০০	১০.৫	১.৯	১.৪০	২.৪	০.২	০.৩৮	০.২২	০.০৪	০.৩৯
২	ভুট্টা	৩৪০০	৮.৫	৪.০	১.১	২.০	০.১৯	০.২১	০.১৬	০.০২	০.২৭
৩	চালের ক্ষুদ	৩০০০	৮.০	৩.৮	-	০.৭০	০.১৯	০.২০	০.১০	০.০৩	০.৩৩
৪	জোয়ার	৩৩০০	১০.৫	৩.০	১.২	২.৫	০.১৩	০.২	০.১৫	০.০৪	০.৩২
৫	ঝোলা গুড়	১৯৬০	৩.০	০.১	১.৫	-	-	-	-	০.৯	০.১
৬	গমের ভুষি	১১০০-১৩০০	১৩-১৫	০.১৭	১.৫	১০	০.১৭	০.৫	০.২	০.১১	১.২১
৭	চালের মিহি কুঁড়া	২৯৫০	১২	১২	০৮	১০	০.৩১	০.৫৯	০.৩৭	০.১৪	১.৪৯
৮	সয়াবিন মিল	২২৪৪	৪৪	০.৫	০৬	৫.২	০.৬৩	২.৮২	০.৬৭	০.৩	০.৬
৯	নারকেল খৈল	১৩৫০	২৫	৮.৫	০৭	১২	০.৩	০.৬	০.৬১	০.২	০২
১০	সরিষার খৈল	২০০০-২২০০	৩৫.৮	১২.৭	১০.৭	০৯	০.৯২	১.৬৭	-	০.৮৩	০.২
১১	তিলের খৈল	২৪৬৪	৩১	০৭	৫.৫	৬.৫	১.৪	১.৩	০.৫৭	২	০.১৩
১২	শুঁটকি গুঁড়া	২৬৫০	৪০-৫৫	১	৪২	০.৪	২.৭	১.৮	০.৮	৩.৮	২.৫
১৩	প্রোটিন কনসেনট্রেট	২৭০০-২৮০০	৫৫-৬০	০৮	-	০.৫	-	-	-	৩	২.৩
১৪	শুকনা রক্ত	২৭৫০	৭৫-৮৩	১.৬	২৩	-	০.৯	৬.৯	১.৪	০.২৮	০.২২
১৫	পোল্ট্রির নাড়িভুঁড়ি সিদ্ধ	২৯০০	৫৮	১৩.৫	২০	-	১.১	৬	-	৩.৬	২.২
১৬	ফেদার মিল	২৩০০	৮০	২.৫	১০.৫	০১	০.৫	১.৫	০৩	০.২	০.৬
১৭	মাছের তেল	৭৬৭৮	৯৫	-	-	-	-	-	-	-	-

২০২৫

১৮	হাড়ের গুঁড়া	-	-	-	-	-	-	-	-	২৪	১২
১৯	ঝিনুক	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৭	-
২০	চুনাপাথর	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৩	-

হাঁসের বিভিন্ন বয়সে প্রয়োজনীয় পুষ্টিমান

পুষ্টিমানের নাম	বাচ্চা হাঁস	বাড়ন্ত হাঁস	ডিমপাড়া থেকে শেষ পর্যন্ত
	০-৮ সপ্তাহ	৮-২০ সপ্তাহ	২০ - শেষ পর্যন্ত
বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালরি/কেজি)	২৭০০	২৭০০	২৮০০
আমিষ (%)	২০	১৮	১৬

২.৭ হাঁসের সুষম খাদ্য প্রস্তুতি

খামারের দৈনন্দিন খরচের প্রায় ৬৫-৭০% ব্যয় হয় খাদ্যের জন্য। তাই সুষম খাদ্য তৈরিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

- খাদ্যে হাঁসের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পরিমাণমত থাকতে হবে। তাই সুষম খাদ্য তৈরির পূর্বে খাদ্য উপকরণসমূহের পুষ্টিমান জানতে হবে।
- সুষম খাদ্য তৈরির পূর্বে হাঁসের জাত, বয়স ও ওজন জানতে হবে।
- প্রস্তুতকৃত খাদ্যে কোনো প্রকার পঁচা বা দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য উপকরণ ব্যবহার পরিহার করতে হবে।
- খাদ্য উপকরণ সহজলভ্য হতে হবে।
- প্রস্তুতকৃত খাদ্য সহজপাচ্য হতে হবে।
- প্রস্তুতকৃত খাদ্য হাঁসের জন্য পছন্দনীয় হতে হবে।
- তৈরিকৃত খাদ্য শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং ৬-৭ দিনের মধ্যেই ব্যবহার করা উত্তম।

সুষম খাদ্যের গুরুত্ব-

হাঁসকে সুষম খাদ্য প্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি হাঁসকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করা না হয়, তবে যে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থাকে তার কারণে হাঁসের নানা রকমের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সুষম খাদ্য সরবরাহের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ-

- হাঁসের উৎপাদন (যেমন- ডিম, মাংস, বাচ্চা ফোটার হার, সুস্থ সবল বাচ্চা) বৃদ্ধি পায়।
- পুষ্টির অভাবজনিত রোগ ও অন্যান্য রোগ কম হয়।
- খামারে লাভ বেশি হয়।
- খামারে হাঁস দ্রুত বেড়ে উঠে।
- উৎপাদিত ডিম এবং মাংসের গুণগতমান ভালো হয়।
- হাঁসের মৃত্যুর হার হ্রাস পায়।

হাঁসের সুষম খাদ্য তালিকা

হাঁসের সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করার সময় নিম্নলিখিত শর্তগুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে:

ক) প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান

যে বয়সের হাঁসের জন্য খাদ্য তালিকা তৈরি করা হবে, উক্ত হাঁসের চাহিদা অনুযায়ী সবকটি প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান পরিমাণমত আছে কি না হিসাব করে দেখতে হবে।

খ) পুষ্টিমান

আদর্শ পুষ্টিমান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মান অনুযায়ী হাঁসের বয়স অনুপাতে আমিষ, বিপাকীয় শক্তি, চর্বি, আঁশ জাতীয় পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ ও অ্যামাইনো এসিড এর পরিমাণ যতদুর সম্ভব সঠিক রাখার চেষ্টা করতে হবে।

গ) আমিষ ও বিপাকীয় শক্তির অনুপাত

আমিষ ও বিপাকীয় শক্তির অনুপাত স্বীকৃত মান অনুযায়ী সঠিক না হয়ে কম বেশি হলে হাঁসের দেহে চর্বি জমে মোটা হয়ে যেতে পারে বা পুষ্টির অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া এদের মধ্যে নানা ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সুতরাং খাদ্য তালিকা তৈরির সময় আমিষ ও বিপাকীয় শক্তির অনুপাত যথটা সম্ভব স্বীকৃত মানের কাছাকাছি হতে হবে।

ঘ) সস্তা ও সহজলভ্য

খাদ্য তালিকায় ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণগুলো অবশ্যই সহজলভ্য হতে হবে। খামারের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা নিকটস্থ বাজারে যে ধরনের খাদ্য উপকরণ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় এবং মূল্য কম, যতটা সম্ভব ঐ সমস্ত খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। আদর্শ মান অনুযায়ী খাদ্য তালিকার সকল উপাদান ঠিক রেখে স্থানীয়ভাবে সস্তা উপকরণ ব্যবহার করে যতটা সম্ভব খাদ্য মূল্য কমিয়ে রাখতে হবে।

ঙ) সুস্বাদু ও রুচিকর খাদ্য

সুষম খাদ্য তৈরির সময় অধিক আঁশযুক্ত এবং অরুচিকর খাদ্য উপকরণ যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করতে হবে। গমের ভূষি, চালের কুঁড়া, নারিকেলের খৈল, সয়াবিনের খৈল, ইপিল-ইপিল পাতা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে হাঁসের খাদ্যের জন্য কিছুটা অরুচিকর হওয়ায় বা কোনো কোনো উপকরণে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকায় অত্যন্ত সাবধানতার সাথে এবং পরিমাণমত ব্যবহার করতে হয়। খাদ্য তালিকায় নানা ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য উপকরণের সমন্বয়ে খাদ্য মিশ্রণ সুস্বাদু করার চেষ্টা করতে হবে।

চ) সঠিক মিশ্রণ

প্রতিটি খাদ্য উপকরণ যাতে ভালোভাবে মিশানো হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শস্যদানা জাতীয় খাদ্য উপকরণ যেমন গম, ভুট্টা ইত্যাদি ভালোভাবে গুঁড়া করতে হবে। তা না হলে ভিটামিন খনিজ প্রিমিক্স বা ব্যবহৃত ঔষধ সমভাবে মেশানো কঠিন হবে।

ছ) খাদ্য উপদানবিহীন অন্যান্য উপকরণ

সুষম খাদ্যকে রোগ জীবাণুর আক্রমণ হতে এবং পঁচনের হাত থেকে রক্ষার জন্য এবং হাঁসের দ্রুত শরীর বৃদ্ধি বা উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তার জন্য বিশেষ ধরনের ঔষধ, হরমোন, এন্টি অক্সিডেন্ট খাদ্যের সাথে পরিমাণমত মিশানো যেতে পারে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- মুক্ত অবস্থায় পালনে হাঁস যে খাদ্যগুলো সংগ্রহ করে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
- হাঁসের বিভিন্ন বয়সে প্রয়োজনীয় পুষ্টিমানের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
- হাঁসের সুষম খাদ্য নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

সুষম খাদ্য তালিকা তৈরির সাধারণ নিয়ম-

সুষম খাদ্য তালিকা প্রণয়নের সময় নিম্নলিখিত হারে পুষ্টি উপাদানসমূহ মিশাতে হবে

১. শক্তি প্রধান/শর্করা জাতীয় খাদ্য (৬০% হতে ৭০% ভাগ)

(ক) শস্যদানা জাতীয় খাদ্য বিশেষ করে গম, ভুট্টা, যব, জই, জোয়ার এবং

(খ) শস্যদানার উপজাত বিশেষ করে ভূষি বা কুঁড়া, গমের ভূষি, চাউলের কুঁড়া, ডালের ভূষি ইত্যাদি

এক বা একাধিক খাদ্য উপকরণ মিলে ৬০% হতে ৭০% ভাগ পর্যন্ত খাদ্য মিশ্রণে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ জাতীয় খাদ্য উপকরণ হতে প্রচুর পরিমানে তাপ শক্তির পাশাপাশি অন্যান্য উপাদানও কম বেশি পাওয়া যায়।

২. আমিষ জাতীয় খাদ্য (২০% হতে ৩০% ভাগ)

আমিষ জাতীয় খাদ্য উপকরণ দুইটি উৎস থেকে পাওয়া যায়। যথা-

ক) উদ্ভিদজাত উৎস

খ) প্রাণিজ উৎস

হাঁসের খাদ্য তালিকায় আমিষ জাতীয় খাদ্য উপকরণসমূহ হলো-

ক) উদ্ভিদজাত আমিষ উপকরণসমূহ - সয়াবিন মিল, তিলের খৈল, বাদাম ও সরিষার খৈল ইত্যাদি।

খ) প্রাণিজ আমিষ উপকরণসমূহ - ফিস মিল, ব্লাড মিল, প্রোটিন কনসেনট্রেট, ফিদার মিল এক বা একাধিক উপকরণ ৫%-১৫% পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৩. খনিজ জাতীয় উপকরণ (২-৯% ভাগ)

খাদ্য তালিকায় খনিজ উপাদান বিশেষ করে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের ঘাটতি পূরণের জন্য খাদ্য মিশ্রণের সাথে বয়স ভেদে ২-৯% ভাগ পর্যন্ত ঝিনুকের গুড়া, হাঁড়ের গুড়া, চুনাপাথরের গুড়া বা ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট যোগ করতে হয়।

৪. লবণ

খাদ্য সহজে হজম হওয়া ও রুচিবৃদ্ধির জন্য খাদ্য মিশ্রণের সাথে হাঁসের বয়স ভেদে বা বিভিন্ন স্তরে ০.২৫-১% ভাগ পর্যন্ত লবণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. ভিটামিন

খাদ্য মিশ্রণের সাথে হাঁসকে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের অভাব পূরণের জন্য ২-৩% সবুজ শাকসবজি বা ০.২৫-০.৩% ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও খাদ্য মিশ্রণের সাথে খাদ্য উপাদানবিহীন উপকরণ যেমন- অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইত্যাদি পরিমাণমত ব্যবহার করা যেতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে, প্রতিটি খাদ্য উপকরণ ব্যবহারের সময় সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মাত্রার কম বা বেশি খাদ্য যাতে ব্যবহার না হয়। নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে খাদ্য উপকরণ কম বা বেশি ব্যবহার হলে হাঁসের মধ্যে নানা ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

সুষম খাদ্য তৈরির সময় পুষ্টির উৎস অনুসারে খাদ্য উপকরণ যোগ করার নিয়ম-

১. শক্তির উৎসের জন্য : শস্যদানা ও এর উপজাত ৬০-৭০%

২. আমিষের জন্য : ক) প্রাণিজ আমিষের উৎস ৫-১৫%

খ) উদ্ভিদ আমিষের উৎস ১৮-২২%

৩. খনিজ মিশ্রণ : ২-৯%

৪. ভিটামিন : প্রিমিক্স ও ১০০ কেজি মিশ্রিত খাদ্যে ৩ কেজি পাতা জাতীয় শাকসবজি।

সুষম খাদ্য তৈরিতে খাদ্য উপকরণ ব্যবহারের সর্বোচ্চ মাত্রা (শতকরা হার)

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	ব্যবহারের পরিমাণ (%)
১	শস্যদানা জাতীয়	৪৫-৬০
২	ভূষি/কুঁড়া জাতীয়	১০-২৫
৩	উদ্ভিদ আমিষ	১০-২৫
৪	প্রাণিজ আমিষ	১০-১৫
৫	খনিজ লবণ	২.৫-৯
৬	লবণ (NaCl)	০.২৫-১
৭	ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	০.২৫-০.৩০

হাঁসের সুষম খাদ্য তৈরির ধাপ

১) প্রথমে ঘরের মেঝে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

২) যে সকল খাদ্য উপাদান অধিক পরিমাণে লাগে যেমন- ভুট্টা, গম, কুঁড়া, সয়াবিন মিল, প্রোটিন কানসেনট্রেট সেগুলো ওজন করতে হবে ও মেঝেতে ঢালতে হবে।

৩) খাদ্য উপাদান প্রতিটি ঢালার পর হাত দিয়ে সমান করে ছড়িয়ে দিতে হবে।

৪) পরিমাণে কম লাগে এমন উপাদান (ভিটামিন, ডিসিপি, লাইসিন, মিথিওনিন, লবণ, খনিজ মিশ্রণ) ওজন করে একসঙ্গে ভালোভাবে মেশাতে হবে।

৫) এ মিশ্রণকে পূর্বের খাদ্য উপাদানের স্তুপের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।

৬) এর পর হাত দিয়ে বা মেশিনের সাহায্যে ৩-৪ বার খাদ্য ভালোভাবে মেশাতে হবে।

৭) সমস্ত মিশ্রণকে বস্তায় ভরে মজুদ করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে হবে।

৮) এ ধরনের মিশ্রিত খাদ্যকে ম্যাশ খাদ্য বলে।

সুষম খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন

- রেশন ফরমুলেশনের পূর্বে অবশ্যই উপকরণের পুষ্টিগত গুণাগুণ এবং ভৌত অবস্থা পরীক্ষা করতে হবে।
- ভেজা ছত্রাকযুক্ত, দলাপাকা এবং দূষিত খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না।
- খাদ্যে জলীয় অংশের পরিমাণ কখনও ১২ শতাংশের বেশি হওয়া যাবে না।
- ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে এবং অপরিচ্ছন্ন স্থানে খাদ্য মিশ্রণ করা যাবে না।
- খাদ্য তৈরির পর অধিক সময় ধরে খাদ্য মাটিতে বা মেঝেতে ফেলে রাখা যাবে না।
- খাদ্য প্রস্তুতকারীকে অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।

২.৮ সুষম খাদ্য সংরক্ষণ

- খাদ্য গুদামে সঠিক বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে যা খাদ্যকে আর্দ্র হওয়া থেকে মুক্ত করবে।
- খাদ্য বস্তা মেঝে/ মাটিতে না রেখে কিছুটা উঁচুতে তাক বা মাচা করে রাখতে হবে।
- খাদ্য বস্তা দেয়াল ঘেঁষে রাখা উচিত নয়।
- খাদ্য গুদাম বিষাক্ত পোকামাকড়, ইঁদুর এবং কীটপতঙ্গ মুক্ত হতে হবে।
- বৃষ্টির পানি যেন খাদ্য গুদামে না প্রবেশ করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- সরাসরি রোদের আলো থেকে দূরে শুষ্ক স্থানে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- খাবারের বস্তার মুখ খোলা থাকলে বাতাসে অধিক আর্দ্রতার কারণে ছত্রাক জন্মাতে পারে সে জন্য মুখ বন্ধ রাখতে হবে।
- খাবার খোলা অবস্থায় মাটিতে স্তুপ আকারে রাখা সঠিক নয়, কারণ স্তুপে অধিক তাপ উৎপাদন হয়ে খাদ্যের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।
- খাদ্যের সাথে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকনাশক ব্যবহারের অন্তত ২৪ ঘন্টা পর সেই খাদ্য ব্যবহার করতে হবে।
- খাবারের পাত্রে হাঁস যাতে পায়খানা করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- মিশ্রিত খাদ্য বেশি দিন রাখা যাবে না, তিন দিনের বেশি খাদ্য একবারে তৈরি করা যাবে না।
- হাঁসের খাদ্য ও ডিম একত্রে রাখা যাবে না।

বয়স অনুযায়ী হাঁসের খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. স্টার্টার রেশন : ০-৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত হাঁসকে এই খাদ্য দেয়া হয়।

২. গ্রোয়ার রেশন : ৯-২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত হাঁসকে এই খাদ্য দেয়া হয়।

৩. ফিনিশার রেশন: ২০ সপ্তাহ বয়স থেকে এর উপরের বয়স পর্যন্ত এই খাদ্য দেয়া হয়।

নিচে স্টার্টার, গ্রোয়ার ও ফিনিশার রেশন তালিকার নমুনা দেয়া হল-

১. স্টার্টার রেশন (০-৮ সপ্তাহ) বাচ্চার খাদ্য তৈরির নমুনা -১

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (শতকরা হার)
১	ভুট্টা বা ভুট্টা ভাঙা	৫৩
২	চাউলের কুঁড়া	১১
৩	গমের ভূষি	৪.২৫
৪	সয়াবিন মিল	২৩
৫	শুঁটকি মাছের গুঁড়া (ফিস মিল)	৬
৬	ঝিনুকের গুঁড়া	২
৭	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.২৫
৮	লবণ	০.৫০
	মোট	১০০

নমুনা -২

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (শতকরা হার)
১	ভুট্টা বা ভুট্টা ভাঙা	৫৪
২	চাউলের কুঁড়া	১৪
৩	সয়াবিন মিল	২১
৪	প্রোটিন কনসেনট্রেট	০৭
৫	ঝিনুকের গুঁড়া	২
৬	জি. এস.	০.২৫
৭	ডি. সি. পি.	০.৫০
৮	লবণ	০.৫০
৯	টক্সিন বাইন্ডার	০.২৫
	মোট	১০০

উপরোক্ত তৈরি খাবারে প্রায় ২০% আমিষ এবং ২৭০০ কিলোক্যালরি/কেজি শক্তিমান থাকবে।

২. গ্রোয়ার রেশন (৯-২০ সপ্তাহ) বাড়ন্ত বাচ্চার খাদ্য তৈরির নমুনা-১

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (শতকরা হার)
১	ভুট্টা বা ভুট্টা ভাঙা	৫৪
২	চাউলের কুঁড়া	১৪
৩	গমের ভূষি	৭.২৫
৪	সয়াবিন মিল	১৮
৫	শুটকি মাছের গুড়া (ফিস মিল)	০৪
৬	ঝিনুকের গুড়া	০২
৭	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.২৫
৮	লবণ	০.৫০
	মোট	১০০

নমুনা- ২

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (শতকরা হার)
১	ভুট্টা গুড়া	৫৬
২	চাউলের কুঁড়া	১৬
৩	সয়াবিন মিল	২০
৪	প্রোটিন কনসেনট্রেট	০৬
৫	জি. এস.	০.২৫
৬	ডি. সি. পি.	০.৫
৭	লাইসিন	০.০৪
৮	মিথিওনিন	০.০৪
৯	লবণ	১
১০	টক্সিন বাইন্ডার	০.১৭
	মোট	১০০

উপরোক্ত তৈরি খাবারে প্রায় ১৮% আমিষ এবং ২৭০০ কিলোক্যালরি/কেজি শক্তিমান থাকবে।

৩. ফিনিশার খাদ্য (২০ সপ্তাহ থেকে উপরের বয়সের জন্য) হাঁসের খাদ্য তৈরির নমুনা- ১

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (শতকরা হার)
১	ভুট্টা	৫৮.০
২	চাউলের কুঁড়া	৮.০
৩	গমের ভূষি	৩.০
৪	সয়াবিন মিল	১৯.০০
৫	শুটকি মাছের গুড়া (ফিস মিল)	৩.০০

২০২৫

৬	ঝিনুকের গুড়া	৮.২৫
৭	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.২৫
৮	লবণ	০.৫০
	মোট	১০০

নমুনা-২

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (শতকরা হার)
১	ভুট্টা গুড়া	৫১%
২	চাউলের কুঁড়া	২০%
৩	সয়াবিন মিল	২১%
৪	প্রোটিন কনসেনট্রেট	৬.৪৪%
৫	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.২৫%
৬	ডি. সি. পি.	০.৫%
৭	লাইসিন	০.০৫%
৮	মিথিওনিন	০.০৬%
৯	লবণ	০.৫০%
১০	টক্সিন বাইন্ডার	০.২০%
	মোট	১০০

উপরোক্ত তৈরি খাবারে প্রায় ১৬% আমিষ এবং ২৮০০ কিলোক্যালরি/কেজি শক্তিমান থাকবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- সুষম খাদ্য তৈরিতে খাদ্য উপকরণ ব্যবহারের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখ করো।
- হাঁসের জন্য সুষম খাদ্য তৈরির ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখো।
- প্রস্তুতকৃত সুষম খাদ্য সংরক্ষণের জন্য কী কী পদক্ষেপ অবলম্বন করতে হয় তা লেখো।
- ডিমপাড়া হাঁসের জন্য ৫০ কেজি ওজনের সুষম খাদ্য তৈরির নমুনা প্রস্তুত করো।

২.৯ হাঁসের খাদ্য সরবরাহ পদ্ধতি:

হাঁসের খাদ্য সরবরাহের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সূচি প্রয়োজন। সময়সূচি অনুযায়ী প্রতিদিন একই সময়ে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। উন্মুক্ত অবস্থায় হাঁস পালন করা হলে হাঁসকে সকাল বেলায় জলাশয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। জলাশয় থেকে সারাদিন খাদ্য সংগ্রহ করে খেয়ে থাকে। সন্ধ্যাবেলা ঘরে তোলার সময় কিছু খাবার প্রদান করা হয়। অপরদিকে আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালন করলে শুধুমাত্র প্রদানকৃত খাবারের উপর নির্ভর করে চলতে হয়। সে কারণে হাঁসকে তার বয়স ও উৎপাদন এর উপর ভিত্তি করে সুষম রেশন প্রদান করা হয়।

ডিম উৎপাদনকারী হাঁসের বয়স অনুযায়ী দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ

বাচ্চা হাঁস		বাড়ন্ত হাঁস		প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁস	
বয়স (সপ্তাহ)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/দিন)	বয়স (সপ্তাহ)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/দিন)	বয়স (সপ্তাহ)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/দিন)
১ম সপ্তাহ	১০-১৫	১৩তম সপ্তাহ	১৩৫	২২তম সপ্তাহ বা তদুর্দ্ধ	১৫০-১৬৫
২য় সপ্তাহ	১৫-২০	১৪তম সপ্তাহ	১৩৫		
৩য় সপ্তাহ	৩০-৪০	১৫তম সপ্তাহ	১৪০		
৪র্থ সপ্তাহ	৪০-৫০	১৬তম সপ্তাহ	১৪০		
৫ম সপ্তাহ	৫০-৬০	১৭তম সপ্তাহ	১৪০		
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	৬০-৭০	১৮তম সপ্তাহ	১৪৫		
৭ম সপ্তাহ	৭০-৮০	১৯তম সপ্তাহ	১৪৫		
৮ম সপ্তাহ	৮০-৯০	২০তম সপ্তাহ	১৪৫		
৯ম সপ্তাহ	১০০	২১তম সপ্তাহ	১৪৫		
১০ম সপ্তাহ	১১০				
১১তম সপ্তাহ	১২০				
১২তম সপ্তাহ	১৩০				

বিভিন্ন বয়সের মাংস উৎপাদনকারী হাঁসের দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ

বাচ্চা হাঁস		বাড়ন্ত হাঁস		প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁস	
বয়স (সপ্তাহ)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/দিন)	বয়স (সপ্তাহ)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/দিন)	বয়স (সপ্তাহ)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/দিন)
১ম সপ্তাহ	১৫-২০	১৩তম সপ্তাহ	১৫০-১৬০	২৫তম সপ্তাহ বা তদুর্দ্ধ	১৮০-১৯০
২য় সপ্তাহ	২০-৩০	১৪তম সপ্তাহ	১৫০-১৬০		
৩য় সপ্তাহ	৩০-৪৫	১৫তম সপ্তাহ	১৫০-১৬০		
৪র্থ সপ্তাহ	৪৫-৬০	১৬তম সপ্তাহ	১৬০-১৭০		
৫ম সপ্তাহ	৬০-৭৫	১৭তম সপ্তাহ	১৬০-১৭০		
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	৭৫-৮৮	১৮তম সপ্তাহ	১৬০-১৭০		

৭ম সপ্তাহ	৮৫-১০০	১৯তম সপ্তাহ	১৬০-১৭০		
৮ম সপ্তাহ	১০০-১১০	২০তম সপ্তাহ	১৭০-১৮০		
৯ম সপ্তাহ	১১০-১২০	২১তম সপ্তাহ	১৭০-১৮০		
১০ম সপ্তাহ	১২০-১৩০	২২তম সপ্তাহ	১৭০-১৮০		
১১তম সপ্তাহ	১৩০-১৪০	২৩তম সপ্তাহ	১৭০-১৮০		
১২তম সপ্তাহ	১৪০-১৫০	২৪তম সপ্তাহ	১৭০-১৮০		

হাঁসকে দুই প্রকারে খাদ্য তৈরি করে খাওয়ানো হয়। যথা :

১. ম্যাশ আকারে খাদ্য তৈরি করে খাওয়ানো

২. পিলেট আকারে খাদ্য তৈরি করে খাওয়ানো

ম্যাশ খাদ্য

খাদ্য উপকরণসমূহ একত্রে মিশিয়ে যে দানাদার বা গুঁড়া খাদ্য তৈরি করা হয় তাকে ম্যাশ খাদ্য বলে। ম্যাশ খাদ্য পোল্ট্রি ফিড মিলে বা হাতে তৈরি করা যায়। ম্যাশ খাদ্য হাতে প্রস্তুত করার সময় খেয়াল রাখতে হবে খাদ্যের সবগুলো উপকরণ যেন ভালোভাবে মিশে যায়।



চিত্র: ২.২৪ বিভিন্ন ধরনের ম্যাশ খাদ্য

পিলেট খাদ্য

পিলেট খাদ্য কারখানায় প্রস্তুত করা হয়। পিলেটার মেশিন কিনে ক্ষুদ্র পরিসরে নিজেরাই খাদ্য প্রস্তুত করতে পারি। এই জাতীয় খাদ্য হাতে প্রস্তুত করা যায় না। পিলেট খাদ্য হাঁসের জন্য অধিকতর উপযোগী। এতে খাদ্য অপচয় কম হয়।



চিত্রঃ ২.২৫ বিভিন্ন ধরনের পিলেট খাদ্য

আজকাল বাজারের তৈরি পিলেট জাতীয় খাদ্য কিনতে পাওয়া যায়। তবে এসব খাদ্য ব্যবহারের পূর্বে এদের গুণাগুণ, উপকরণের মান এবং কতদিন পূর্বে তৈরি তা অবশ্যই ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। খাদ্য ৭ (সাত) দিনের বেশি গুদামজাত করা যাবে না, তাহলে ছত্রাকজনিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- হাঁসকে কোন কোন সময়ে খাদ্য প্রদান করতে হয়?
- বয়স অনুযায়ী ডিমপাড়া হাঁসের খাদ্য প্রদানের পরিমানের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
- বয়স অনুযায়ী মাংসজাত হাঁসের খাদ্য প্রদানের পরিমানের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
- ম্যাশ খাদ্য ও পিলেট খাদ্য ব্যবহারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো।

জব ০৪ ঃ হাঁসের খাদ্য উপকরণসমূহ সনাক্তরণ

পারদর্শিতার মানদণ্ড

১) হাঁসের রেশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ সনাক্ত করা

২) খাদ্য উপকরণসমূহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি তথ্য সনাক্ত করা

৩) খাদ্য উপকরণসমূহের গুণগত মান নিশ্চিত করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	১টি
২	রাবার হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
৩	সেফটি গগলস	মাঝারি মাপের	১টি
৪	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৫	হেড কভার	মাঝারি মাপের	১টি
৬	গামবুট	শিক্ষার্থীর পায়ের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	নিক্তি	মাঝারি মাপের	১টি
২	বালতি	মাঝারি মাপের	১টি
৩	মগ	মাঝারি মাপের	১টি
৪	প্লাস্টিকের জার	মাঝারি মাপের	১০টি
৫	মার্কার পেন	উন্নত মানের	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials)

ক্রমিক নং	কাঁচামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ভুট্টা/ভুট্টা ভাঙ্গা	উন্নত মানের	১ কেজি
২	গম/গম ভাঙ্গা	উন্নত মানের	১ কেজি
৩	চালের কুঁড়া	উন্নত মানের	১ কেজি
৪	গমের ভূষি	উন্নত মানের	১ কেজি
৫	সয়াবিন মিল	উন্নত মানের	১ কেজি
৬	ফিস মিল	উন্নত মানের	১ কেজি
৭	প্রোটিন কনসেনট্রেট	উন্নত মানের	৫০০ গ্রাম
৮	ঝিনুকের গুড়া	উন্নত মানের	৫০০ গ্রাম
৯	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	উন্নত মানের	১০০ গ্রাম
১০	লবণ	উন্নত মানের	৫০০ গ্রাম

কাজের ধারা:

১. বাজার ও বিভিন্ন উৎস থেকে হাঁসের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণসমূহ সংগ্রহ করো।



চিত্র: গম



চিত্র: ভুট্টা



চিত্র: চালের কুড়া



চিত্র: গমের ভুষি



চিত্র: সয়াবিন মিল



চিত্র: ফিস মিল



চিত্র: প্রোটিন কনসেনট্রেট



চিত্র: ঝিনুকের গুড়া



চিত্র: ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স

২. খাদ্য উপকরণসমূহের সঠিক পুষ্টিমান বই পুস্তক, ম্যাগাজিন, জার্নাল বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করো।

৩. খাদ্য উপাদানসমূহের উৎকৃষ্ট মান যেমন- দানাদার অবস্থা, আর্দ্রতা, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদি সঠিক ভাবে আছে কি না যাচাই করো।



চিত্র:- হাঁসের ম্যাশ খাদ্য



চিত্র: হাঁসের পিলেট খাদ্য

বাংলাদেশে সাধারনত নিম্নলিখিত খাদ্য উপাদান সমুহ হাঁসের খাদ্য তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। যাদের পুষ্টিমানের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো-

খাদ্য উপাদান	শক্তি (কি. ক্যাল/ কেজি)	আমিষ (%)	ক্যালসিয়াম (%)	ফসফরাস (%)
শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদান				
১. গম/ গম ভাঙ্গা				
২. ভুট্টা/ভুট্টা ভাঙ্গা				
৩. রাইস পোলিশ				
৪. গমের ভূষি				

২০২৫

আমিষ জাতীয় খাদ্য উপাদান				
১. তিলের খৈল				
২. সরিষার খৈল				
৩. নারিকেল খৈল				
৪. বাদাম খৈল				
৫. সয়াবিন ভাঙ্গা				
৬. সয়াবিন মিল				
৭. ফিস মিল (বিদেশী)				
৮. শুটকি মাছ (দেশী)				
৯. প্রোটিন কনসেনট্রেট				
১০. রক্তের গুড়া				
চর্বি জাতীয় খাদ্য উপাদান				
১. সয়াবিন তেল				
খনিজ জাতীয় খাদ্য উপাদান				
১. হাড়ের গুড়া				
২. শামুক/ঝিনুকের খোসা				
৩. ডিমের খোসা				
৪. চুনা পাথর				

এছাড়াও পোল্ট্রি খাদ্যে বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম ভিটামিন ও খনিজ উৎস, ছত্রাক ও টক্সিন বাইন্ডার, এনজাইম, কৃত্রিম এমাইনো এসিড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যেমন-

ক) ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স, জি এস, ডব্লিউ এস এবং এল লাইসিন

খ) ছত্রাক বাইন্ডার- মোল্ড ষ্টপ, সরবাটক্স

গ) টক্সিন বাইন্ডার-ডট, ইএসবি-৩

ঘ) কৃত্রিম অ্যামাইনো এসিড- লাইসিন, মিথিওনিন

ঙ) ইলেকট্রোলাইট ইত্যাদি

৪. প্রতিটি উপাদানের পুষ্টিমান সঠিকভাবে জেনে নিয়ে মান ও ব্যবহার অনুযায়ী গ্রুপে ভাগ করে লিপিবদ্ধ করো।

৫. এরপর প্রতিটি খাদ্যউপাদানের নমুনা পৃথকভাবে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের জারে রেখে তার গায়ে নাম লিখে রাখো।

৬. কাজ শেষে কক্ষটি পরিষ্কার করে খাদ্য উপাদানসহ প্লাস্টিকের জারগুলো সুন্দরভাবে শুষ্ক ও ঠান্ডা জায়গায় সাজিয়ে রাখো।

সতর্কতা

১. কোন ভাবেই ভেজাল বা নিম্নমানের খাদ্য উপকরণ সংগ্রহ করা যাবে না।

২. নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে খাদ্যের পুষ্টি উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে।

৩. খাদ্য উপকরণসমূহ সঠিকভাবে লেবেলিং করে শুষ্ক ও ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হবে যাতে সহজে নষ্ট না হয়।

জব ০৫ ঃ ডিমপাড়া হাঁসের সুষম খাদ্য প্রস্তুতকরণ

পারদর্শিতার মানদণ্ড

১) ডিমপাড়া হাঁসের রেশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ সনাক্ত করা

২) খাদ্য উপকরণসমূহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি তথ্য সনাক্ত করা

৩) খাদ্য উপকরণসমূহের মিশ্রণে ডিমপাড়া হাঁসের জন্য সুষম রেশন প্রস্তুত করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	১টি
২	রাবার হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
৩	সেফটি গগলস	মাঝারি মাপের	১টি
৪	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৫	হেড কভার	মাঝারি মাপের	১টি
৬	গামবুট	শিক্ষার্থীর পায়ের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	নিক্তি	মাঝারি মাপের	১টি
২	বালতি	মাঝারি মাপের	১টি
৩	মগ	মাঝারি মাপের	১টি
৪	প্লাস্টিকের জার	মাঝারি মাপের	১০টি
৫	মার্কার পেন	উন্নত মানের	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials)

ক্রমিক নং	কাঁচামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ভুট্টা/ভুট্টা ভাঙ্গা	উন্নত মানের	৫৫ কেজি
২	গম/গম ভাঙ্গা	উন্নত মানের	১০ কেজি

৩	চালের কুঁড়া	উন্নত মানের	১৫ কেজি
৪	গমের ভূষি	উন্নত মানের	১০ কেজি
৫	সয়াবিন মিল	উন্নত মানের	২৫ কেজি
৬	ফিস মিল	উন্নত মানের	৭ কেজি
৭	প্রোটিন কনসেনট্রেট	উন্নত মানের	২ কেজি
৮	ঝিনুকের গুড়া	উন্নত মানের	২ কেজি
৯	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	উন্নত মানের	২০০ গ্রাম
১০	লবণ	উন্নত মানের	৫০০ গ্রাম

কাজের ধারা:

১) তালিকা অনুযায়ী পুষ্টিমানের খাদ্য উপাদানের তালিকা সংগ্রহ করো।

২) বয়স ও উৎপাদন অনুযায়ী পুষ্টিমানের তালিকা মোতাবেক সুষম রেশন ফরমুলেশন করো।

৩) খাদ্য উপাদানসমূহ তালিকা মোতাবেক মেপে পৃথক পৃথক পাত্রে রাখো।

৪) কম পরিমানে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানসমূহ একত্রে ভালভাবে মেশাও।

৫) এরপর কম পরিমাণে ব্যবহৃত উপাদানসমূহ পর্যায়ক্রমে বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের সাথে মেশাও।

৬) খাদ্য উপাদান মেশানো শেষ হলে পুনরায় ভালভাবে উল্টে পাল্টে মিশিয়ে দাও যাতে সকল উপাদান সমভাবে মিশ্রিত হয়।

৭) তৈরিকৃত খাদ্য ঠান্ডা ও শুষ্ক জায়গায় বস্তায় সংরক্ষণ কর ও হাঁসকে খেতে দাও।

ডিমপাড়া হাঁসের নমুনা খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করো।

১. স্টার্টার রেশন (০-৮ সপ্তাহ) বাচ্চার খাদ্য তৈরির নমুনা -১

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (শতকরা হার)
১	ভুট্টা বা ভুট্টা ভাঙা	
২	চাউলের কুঁড়া	
৩	গমের ভূষি	
৪	সয়াবিন মিল	
৫	শুঁটকি মাছের গুঁড়া (ফিস মিল)	
৬	ঝিনুকের গুঁড়া	
৭	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	
৮	লবণ	
	মোট	১০০

নমুনা -২

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (শতকরা হার)
১	ভুট্টা বা ভুট্টা ভাঙা	
২	চাউলের কুঁড়া	
৩	সয়াবিন মিল	
৪	প্রোটিন কনসেনট্রেট	
৫	ঝিনুকের গুঁড়া	
৬	জি. এস.	
৭	ডি. সি. পি.	
৮	লবণ	
৯	টক্সিন বাইন্ডার	
	মোট	১০০

উপরোক্ত তৈরি খাবারে প্রায় ২০% আমিষ এবং ২৭০০ কিলোক্যালরি/কেজি শক্তিমান থাকবে।

২. গ্রোয়ার রেশন (৯-২০ সপ্তাহ) বাড়ন্ত বাচ্চার খাদ্য তৈরির নমুনা- ১

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (শতকরা হার)
১	ভুট্টা বা ভুট্টা ভাঙা	
২	চাউলের কুঁড়া	
৩	গমের ভুষি	
৪	সয়াবিন মিল	
৫	শুটকি মাছের গুড়া (ফিস মিল)	
৬	ঝিনুকের গুড়া	
৭	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	
৮	লবণ	
	মোট	১০০

নমুনা- ২

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (শতকরা হার)
১	ভুট্টা গুড়া	
২	চাউলের কুঁড়া	
৩	সয়াবিন মিল	
৪	প্রোটিন কনসেনট্রেট	
৫	জি. এস.	
৬	ডি. সি. পি.	
৭	লাইসিন	
৮	মিথিওনিন	
৯	লবণ	

১০	টক্সিন বাইন্ডার	
	মোট	১০০

উপরোক্ত তৈরি খাবারে প্রায় ১৮% আমিষ এবং ২৭০০ কিলোক্যালরি/কেজি শক্তিমান থাকবে।

৩. ফিনিশার খাদ্য (২০ সপ্তাহ থেকে উপরের বয়সের জন্য) হাঁসের খাদ্য তৈরির নমুনা- ১

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (শতকরা হার)
১	ভুট্টা	
২	চাউলের কুঁড়া	
৩	গমের ভূষি	
৪	সয়াবিন মিল	
৫	শুটকি মাছের গুড়া (ফিস মিল)	
৬	ঝিনুকের গুড়া	
৭	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	
৮	লবণ	
	মোট	১০০

নমুনা- ২

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (শতকরা হার)
১	ভুট্টা গুড়া	
২	চাউলের কুঁড়া	
৩	সয়াবিন মিল	
৪	প্রোটিন কনসেনট্রেট	
৫	এল	
৬	ডি. সি. পি.	
৭	লাইসিন	
৮	মিথিওনিন	
৯	লবণ	
১০	টক্সিন বাইন্ডার	
	মোট	১০০

. উপরোক্ত তৈরি খাবারে প্রায় ১৬% আমিষ এবং ২৮০০ কিলোক্যালরি/কেজি শক্তিমান থাকবে।

সতর্কতা

১) প্রতিটি সতেজ খাদ্য উপাদান ব্যবহার করতে হবে।

২) টক্সিন বাইন্ডার মিশ্রণ সুষম ও যথোপযুক্ত মাত্রায় হতে হবে।

৩) মিশ্রিত খাদ্য ৭-১০ দিনের বেশী সংরক্ষণ করে রাখা যাবে না।

জব ০৬ : মাংসজাত হাঁসের খাদ্য প্রস্তুতকরণ

পারদর্শিতার মানদণ্ড

১) মাংসজাত হাঁসের রেশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ সনাক্ত করা

২) খাদ্য উপকরণসমূহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি তথ্য সনাক্ত করা

৩) খাদ্য উপকরণসমূহের মিশ্রণে মাংসজাত হাঁসের জন্য সুষম রেশন প্রস্তুত করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	১টি
২	রাবার হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
৩	সেফটি গগলস	মাঝারি মাপের	১টি
৪	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৫	হেড কভার	মাঝারি মাপের	১টি
৬	গামবুট	শিক্ষার্থীর পায়ের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	নিক্তি	মাঝারি মাপের	১টি
২	মগ	মাঝারি মাপের	১টি
৩	প্লাস্টিকের জার	মাঝারি মাপের	১০টি
৪	মার্কার পেন	উন্নত মানের	১টি
৫	মিক্সার মেশিন	উন্নত মানের	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials)

ক্রম	কাঁচামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ভুট্টা/ভুট্টা ভাঙ্গা	উন্নত মানের	৫৫ কেজি
২	চালের কুঁড়া	উন্নত মানের	১৫ কেজি
৩	তিলের খৈল	উন্নত মানের	২০ কেজি
৪	সয়াবিন মিল	উন্নত মানের	২৫ কেজি
৫	ফিস মিল	উন্নত মানের	৭ কেজি
৬	ঝিনুকের গুড়া	উন্নত মানের	২ কেজি
৭	হাড়ের গুড়া	উন্নত মানের	২ কেজি
৮	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	উন্নত মানের	২০০ গ্রাম
৯	লবণ	উন্নত মানের	৫০০ গ্রাম
১০	কোলিন ক্লোরাইড	উন্নত মানের	৫০ গ্রাম



চিত্রঃ মিক্সার মেশিন

কাজের ধারাঃ

১) তালিকা অনুযায়ী পুষ্টিমানের খাদ্য উপাদানের তালিকা সংগ্রহ করো।

২) বয়স ও উৎপাদন অনুযায়ী পুষ্টিমানের তালিকা মোতাবেক সুষম রেশন ফরমুলেশন করো।

৩) খাদ্য উপাদানসমূহ তালিকা মোতাবেক মেপে পৃথক পৃথক পাত্রে রাখো।

৪) কম পরিমাণে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানসমূহ একত্রে ভালভাবে মিশাও।

৫) এরপর কম পরিমাণে ব্যবহৃত উপাদানসমূহ পর্যায়ক্রমে বেশী পরিমানে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের সাথে মেশাও।

৬) খাদ্য উপাদান মিশানো শেষ হলে পুনরায় ভালভাবে উল্টেপাল্টে মিশিয়ে দাও যাতে সকল উপাদান সমভাবে মিশ্রিত হয়।

৭) তৈরিকৃত খাদ্য ঠান্ডা ও শুষ্ক জায়গায় বস্তায় সংরক্ষণ কর ও হাঁসকে সরবরাহ করো।



চিত্র:- হাঁসের ম্যাশ খাদ্যের নমুনা



চিত্র:- হাঁসের পিলেট খাদ্যের নমুনা

মাংসজাত হাঁসের নমুনা খাদ্য তালিকা

১. স্টার্টার রেশন (০-২ সপ্তাহ) বাচ্চার খাদ্য তৈরি

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (শতকরা হার)
১	ভুট্টা ভাঙ্গা	৫০
২	চাউলের কুঁড়া	৬.৬
৩	তিলের খৈল	১৯
৪	সয়াবিন মিল	২২
৫	ঝিনুকের খোসা	০.৫
৬	হাড়ের গুড়া	১.৫৫
৭	লবণ	০.২৫
৮	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.১১
৯	কোলিন ক্লোরাইড	০.০২২
	মোট	১০০

২. গ্রোয়ার রেশন (৩-৮ সপ্তাহ) বাচ্চার খাদ্য তৈরি

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (শতকরা হার)
১	ভুট্টা ভাঙ্গা	৫৬
২	চাউলের কুঁড়া	১৭
৩	তিলের খৈল	১০
৪	সয়াবিন মিল	১৪
৫	ঝিনুকের খোসা	১.০
৬	হাড়ের গুড়া	১.৫৫
৭	লবণ	০.২৫
৮	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.১১
৯	কোলিন ক্লোরাইড	০.০৫
	মোট	১০০

৩. ফিনিশার রেশন (৯-২০ সপ্তাহ) হাঁসের খাদ্য তৈরি

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (শতকরা হার)
১	ভুট্টা ভাঙ্গা	৫২
২	চাউলের কুঁড়া	১৫
৩	তিলের খৈল	১৫
৪	সয়াবিন মিল	১২
৫	ঝিনুকের খোসা	০৩
৬	হাড়ের গুড়া	২.৫৫
৭	লবণ	০.৩৪
৮	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.১১
৯	কোলিন ক্লোরাইড	০.০৫
	মোট	১০০

সতর্কতা

১) প্রতিটি সতেজ খাদ্য উপাদান ব্যবহার করতে হবে ।

২) টক্সিন বাইন্ডার মিশ্রণ সুষম ও যথোপযুক্ত মাত্রায় হতে হবে ।

৩) মিশ্রিত খাদ্য ৭-১০ দিনের বেশী সংরক্ষণ করে রাখা যাবে না ।

২০২৫

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খাদ্য কী?

২. হাঁসের খামারে দৈনন্দিন খরচের শতকরা কত ভাগ খরচ খাদ্যের জন্য প্রয়োজন হয়?

৩. তৈরিকৃত খাদ্য কতদিন সংরক্ষণ করা যায়?

৪. আমিষ জাতীয় খাদ্যের উৎসের নাম লেখ।

৫. ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ জাতীয় খাদ্যের উৎসের নাম লেখো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদান কয়টি ও কী কী?

২. অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদানের কাজ লেখো।

৩. খাদ্য উপাদান প্রাপ্তির উৎস লেখো।

৪. সুষম খাদ্যের বৈশিষ্ট্য লেখো।

৫. সুষম খাদ্যে খাদ্য উপকরণ ব্যবহারের সর্বোচ্চ মাত্রা লেখো।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. সুষম খাদ্য তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করো।

২. ডিম উৎপাদনকারী হাঁসের বয়স অনুযায়ী দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ লেখো।

৩. কীভাবে হাঁসের জন্য সুষম রেশন প্রস্তুত করতে হয় তা লেখো।

৪. ডিম উৎপাদনকারী হাঁসের জন্য ফিনিশার রেশন তৈরি কর (বিপাকীয় শক্তি ২৮০০ কিলোক্যালরী/কেজি এবং আমিষ ২০%)।

তৃতীয় অধ্যায়

হাঁসের রোগ-ব্যাধি

Diseases of Duck





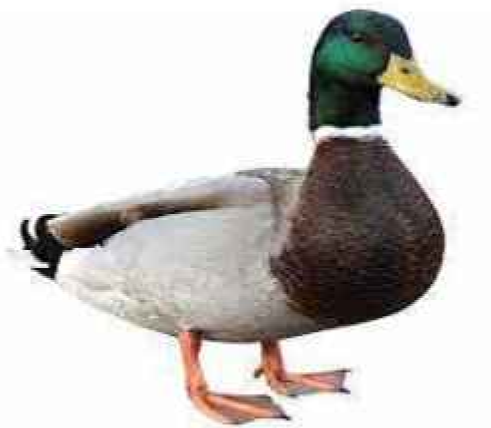
ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, "Prevention is better than cure" অর্থাৎ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। তাই রোগের চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা না করে রোগ যাতে খামারে প্রবেশ করতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। জীবদেহ রোগ-ব্যধি তৈরির কারখানা এবং জীব মাত্রই রোগাক্রান্ত হয়। অন্যান্য প্রাণীদের মত হাঁসেরও রোগ হয়। একজন হাঁস খামারির কাছে রোগ একটা বিরাট সমস্যা। তবে সতর্ক দৃষ্টি ও ভালো ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৃত্যুর হার কমানো যায়। কঠিন রোগের পর হাঁস ভালো হয়ে গেলেও আগের মত স্বাভাবিক স্বাস্থ্য এবং উৎপাদন কোনো দিনই ফিরে আসে না।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- হাঁসের ভাইরাসজনিত রোগ সম্পর্কে বলতে পারব
- হাঁসের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ সম্পর্কে বলতে পারব
- হাঁসের অপুষ্টিজনিত রোগ সম্পর্কে বলতে পারব
- হাঁসের প্লেগ রোগের টিকা প্রদান করতে পারব
- হাঁসের কলেরা রোগের টিকা প্রদান করতে পারব
- হাঁসের খামারের জৈব নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারব

একটি সুস্থ হাঁসের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

- চঞ্চলতা ও চটপটে স্বভাব।
- চোখ উজ্জ্বল।
- পালক সুচারুরূপে পরিপাটি থাকে।
- সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেলা করে।
- পরিমাণমত খাদ্য ও পানি গ্রহণ করবে।
- চরিপার্শ্ব সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকে।
- পায়খানা/বিষ্ঠার প্রকৃতি, পরিমাণ ও রং স্বাভাবিক থাকে ।
- উৎপাদন স্বাভাবিক থাকবে।



চিত্র: ৩.১ একটি সুস্থ হাঁসা



চিত্র: ৩.২ একটি সুস্থ হাঁসি

একটি অসুস্থ হাঁসের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

- হাঁস খাওয়া বন্ধ করে দেয় অথবা কম খায়।
- চুপচাপ বসে থাকে অথবা চলতে অনিহা ভাব দেখা যায়।
- দল ছেড়ে একা একা থাকতে পছন্দ করে।
- চোঁখ দিয়ে পানি পড়ে, চোঁখে পুজ হয়, চোখ বন্ধ করে রাখে।
- নাক মুখ থেকে লালা পড়ে।
- মাথা ফুলে যায়।
- মাথা মাটিতে ফেলে বা একদিকে কাত করে রাখে।
- পা খুঁড়ে খুঁড়ে হাঁটে এবং পায়ের গিরা ফুলে যায়।
- শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়।

- ❖ পাতলা সাদা/সবুজ পায়খানা করে।
- ❖ পালক অগোছালো বা ময়লাযুক্ত থাকে।
- ❖ ডিম পাড়া হাঁসি ডিম পাড়া বন্ধ করে দেয়।



চিত্র: ৩.৩ একটি অসুস্থ হাঁসা



চিত্র: ৩.৪ একটি অসুস্থ হাঁসি

হাঁসকে রোগমুক্ত রাখার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে-

- ❖ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ।
- ❖ স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনা।
- ❖ সুষম ও সুস্বাদু খাদ্য।
- ❖ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে খাদ্য পরিবেশন।
- ❖ পরিমাণমত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ।
- ❖ জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- ❖ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাসস্থান নির্মাণ করা।
- ❖ মৃত হাঁস বা খামার বর্জ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপসারণ করা।

৩.১ হাঁসের রোগের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ

রোগের সংজ্ঞা: পর্যাপ্ত খাদ্য ও উপযুক্ত পরিবেশ দেয়ার পরও যদি শরীরে অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দেয় তবে তাকে রোগ বলে।

হাঁসের রোগ প্রধানত ২ (দুই) ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. সংক্রামক রোগ

২. অসংক্রামক রোগ

১. সংক্রামক রোগ:

যে রোগ জীবাণু বা জীবিত বস্তুদ্বারা সংঘটিত হয় তাকে সংক্রামক রোগ বলে। যেমন : হাঁসের কলেরা, ডাকপ্লেগ ইত্যাদি।

সংক্রামক রোগ দুই প্রকারের। যথা: ছোঁয়াছে ও অছোঁয়াছে রোগ।

যে রোগ আক্রান্ত হাঁসের সংস্পর্শে আসলেই সুস্থ হাঁসটি অসুস্থ হাঁসটির রোগে আক্রান্ত হয় তাকে ছোঁয়াছে রোগ বলে।

যে রোগ আক্রান্ত হাঁসের সংস্পর্শে আসলেও সুস্থ হাঁসটি অসুস্থ হাঁসটির রোগে আক্রান্ত হয় না তাকে অছোঁয়াছে রোগ বলে।

২. অসংক্রামক রোগ

জীবাণু ছাড়া যে রোগ সংগঠিত হয় তাকে অসংক্রামক রোগ বলে।

অসংক্রামক রোগ তিন প্রকার। যথা:

১. আঘাতজনিত রোগ

২. অপুষ্টিজনিত রোগ

৩. বিষক্রিয়াজনিত রোগ।

অন্যভাবে হাঁসের রোগকে সাধরণত ৫ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :

১. ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ : যেমন- হাঁসের কলেরা।

২. ভাইরাসজনিত রোগ : যেমন-ডাক প্লেগ ও হেপাটাইটিস ।

৩. ছত্রাকজনিত রোগ : যেমন- এসপারজিলোসিস।

৪. অপুষ্টিজনিত রোগ : যেমন- প্যারালাইসিস, রিকেট, রাতকানা ইত্যাদি।

৫. পরজীবী জনিত রোগ : যেমন- কৃমি, আঠালি ইত্যাদি।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- রোগ কাকে বলে?
- হাঁসের রোগের শ্রেণিবিন্যাস লেখো।
- একটি সুস্থ হাঁসের ৫টি লক্ষণ লেখো।
- কীভাবে তুমি একটি অসুস্থ হাঁস চিহ্নিত করবে?

৩.২ হাঁসের সাধারণ রোগসমূহের নাম, লক্ষণ ও চিকিৎসা:

আমাদের দেশে হাঁসের সচরাচার যেসমস্ত রোগ হয়ে থাকে সেগুলোর নাম, লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সাধারণ রোগসমূহের নাম :

১. কলিবেসিলোসিস

২. ডাক কলেরা

৩. বটুলিজম রোগ

৪. ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস

৫. ডাক প্লেগ

৬. এসপারজিলোসিস

হাঁসের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণজনিত রোগ

হাঁসের কলিবেসিলোসিস

কলিবেসিলোসিস রোগ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের জন্য হয়ে থাকে। কতকগুলো রোগের সমষ্টিকে কলিবেসিলোসিস রোগ বলা হয়। যথা-

(ক) কলি ফরম সংক্রমণ

(খ) কলি সেপ্টিসেমিয়া

(গ) পুরনো শ্বাসকষ্ট রোগ

(ঘ) বায়ু থলে সংক্রামক রোগ

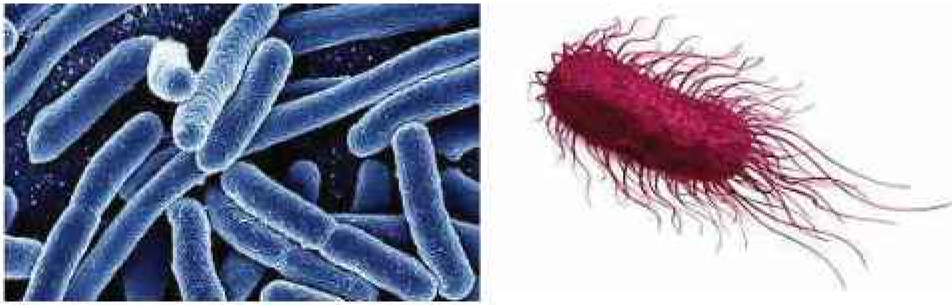
(ঙ) কুসুম থলে সংক্রামক রোগ

(চ) নাভি সংক্রামক রোগ

(ছ) প্যারিটুনিয়ামের প্রদাহ রোগ।

এসকারিশিয়া কলাই (ই-কলাই) নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া বা অণুজীবাণু এসব রোগ সৃষ্টি করে থাকে। এটি গ্রাম নেগেটিভ নন স্পোর সৃষ্টিকারী ছোট দন্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়া। এসকারিশিয়া কলাই নামক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার অনেক ধরনের স্ট্রেইন রয়েছে এবং প্রায় সব প্রাণীতে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু হাঁসে রোগ সৃষ্টিকারী ই-কলাই মানুষসহ অন্য কোনো পশুতে রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। ই-কলাই ব্যাকটেরিয়া/অণুজীবাণু সাধারণত সব প্রাণীর পরিপাক নালিতে এবং খামার পরিবেশে বিদ্যমান থাকে কিন্তু সব সময় রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। মাত্র ১০ থেকে ১৫ ভাগ অণুজীবাণু এ রোগ সৃষ্টি করতে পারে। ই-কলাই একটি সুযোগ সন্ধানী ব্যাকটেরিয়া। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বা অন্যান্য রোগের উপস্থিতিতে এটি মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে থাকে। যেমন-

- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।
- অল্প জায়গায় বেশি হাঁস রাখা হলে।
- ব্যবহৃত লিটার যদি খারাপ হয়ে থাকে।
- অপুষ্টিজনিত কারণে।
- এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরের সময়।
- হঠাৎ তাপমাত্রার পরিবর্তন হলে।
- অন্যান্য রোগের উপস্থিতিতে। যথা- ডাক প্লেগ রোগ।



চিত্র: ৩.৫ এসকারিশিয়া কলাই নামক ব্যাকটেরিয়া

অত্যধিক শীত বা গরমে এ রোগ অণুজীবাণু বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে না। সাধারণ জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে এ রোগের অনুজীবাণু মারা যায়। পরিবেশের আর্দ্রতা যখন কম থাকে এবং পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা স্বভাবিক থাকে তখন ধুলোবালি ও বিছানায় এ রোগ অণুজীবাণু অনেকদিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে। পরিবেশে বাতাসের আর্দ্রতা যদি বেড়ে যায় তখন ই-কলাই বেশি দিন বাঁচতে পারে না, ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ অণুজীব মারা যায়।

মাংস উৎপাদনের জন্যে পালিত হাঁসের খামারে উন্নত ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা সত্ত্বেও ২/৪টি হাঁস মারা যেতে পারে। কিন্তু অনুন্নত ব্যবস্থাপনা, যেমন- অল্প জায়গায় বেশি বাচ্চা রাখা হলে অথবা যদি খারাপ বিছানা ব্যবহার করা হয় তা হলে মড়ক মহামারি আকারে দেখা দিতে পারে সাধারণত ব্রয়লার হাঁসের বয়স যখন ৪-৬ সপ্তাহ হয়ে থাকে তখন এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়ে থাকে এবং জবেহ করার বয়স পর্যন্ত অনেক হাঁস মারা যেতে পারে।

রোগ বিস্তার:

- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ডিম পাড়লে।
- ডিম্বাশয় যদি এ রোগ অণুজীব দ্বারা সংক্রমিত হয়ে থাকে তা হলে ডিম তা দিয়ে বাচ্চা ফোটালে তাতে এ রোগ ছড়াতে পারে।
- অন্ত্রে বিদ্যমান বিষ্ঠার সাথে বের হয়ে আসে এবং সে অবস্থায় যদি ডিম পারে তা অবসারণীতে থাকা বিষ্ঠার দ্বারা কলুষিত হলে, ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো হলে বাচ্চাতে এ রোগ হতে পারে।

- এ রোগের জীবাণু শ্বাসের সাথে দেহে প্রবেশ করতে পারে।
- সংক্রমিত হাঁসের বিষ্ঠা দ্বারা খাদ্য ও পানি কলুষিত হলে এ রোগ হতে পারে।

হাঁসের বৃহদান্তে সাধারণত এ রোগ অনুজীব বসবাসের জন্যে উপযুক্ত স্থান। অন্ত্রের অন্য কোনো অংশ বসবাসের জন্যে তেমন উপযুক্ত নয়। তাই বৃহদান্ত্রে এ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।
এ রোগ অণুজীব দ্বারা কলুষিত খাদ্য ও পানি গ্রহণ করার পর অন্ত্রের উপরিভাগে এগুলো বংশবৃদ্ধি করে। কারণ এ অংশে কোনো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না।

ফলে অন্ত্রের এ অংশে প্রদাহ দেখা দেয় যা পাতলা পায়খানার অন্যতম কারণ। কোনো কোনো সময় এ রোগ অণুজীবীর দ্বারা তৈরি টক্সিন অন্ত্র থেকে রক্তের মাধ্যমে যকৃত, প্লীহা ও বৃক্কে পৌছে এবং এগুলোর মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। বাচ্চা হাঁসের শ্বাসকষ্ট সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। কারণ শ্বসনতন্ত্রের উপরিভাগ অংশে সংক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। এ সংক্রমণ যদি বায়ু থলেতে পৌছে তা হলে শ্বাসনালী ও ফুসফুসে ক্ষতের সৃষ্টি করে।

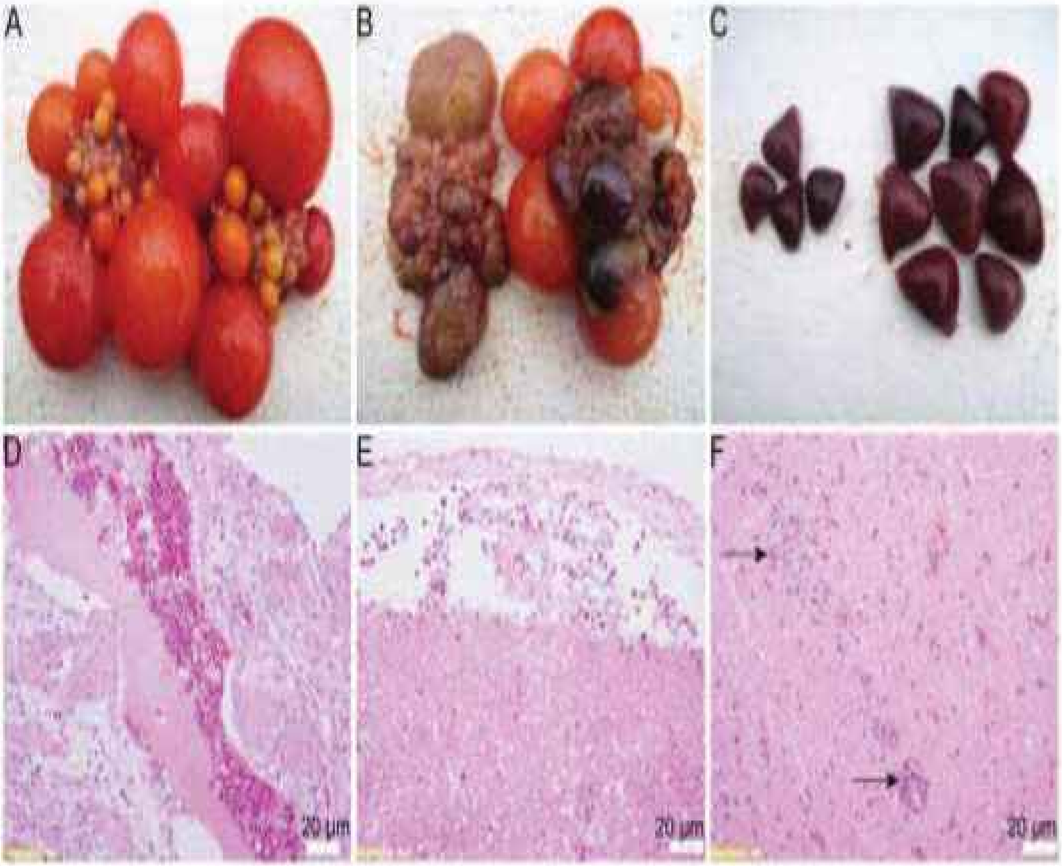
রোগের লক্ষণঃ

দেহের কোনো অংশ এ রোগ অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হয় এর উপরই কলিসেপ্টিসেমিয়া রোগের লক্ষণ নির্ভর করে।

- হঠাৎ করে হাঁস অসুস্থ হয়ে পড়ে।
- নির্জীব দেখায়, চুপ করে বসে থাকে, হঠাৎ করে মারা যায়।
- শ্বাসকষ্ট, নাকের শ্লেষ্মা দূর করার জন্যে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে থাকে, গড় গড় শব্দ হয় বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে বেশি শোনা যায়।
- হাঁসগুলো অশান্ত দেখায়।
- খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।
- মৃত্যুর হার দ্বিগুণ/তিনগুণ বেড়ে যায়।
- আক্রান্ত বাচ্চা হাঁসের দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- অসম দেহ বৃদ্ধির জন্যে ব্রয়লার হাঁসের মাংস কম মূল্যে বিক্রয় করতে হয় যা আর্থিক লোকসানের কারণ। গিরা প্রদাহ এবং হাড়ের প্রদাহ এ রোগ অণুজীবাণু দ্বারা হয়ে থাকে। বাড়ন্ত হাঁসে গিরা প্রদাহের ফলে গোড়ালি ফুলে যায়, আক্রান্ত হাঁস খোড়াতে থাকে, এমনকি ঠিকভাবে চলতে পারে না।

ডিম্বাশয়ের প্রদাহ :

হাঁসের পেটে পিন্ডের ন্যায় দেখা যায়। ফলে এ রোগে আক্রান্ত হাঁসের পেট বড় দেখায়। কোনো কোনো হাঁস ই-কলাই নামক রোগ অণুজীবী দ্বারা ডিম্বাশয় ও ডিম্ববাহি নালি সংক্রমিত হওয়ার ফলে এগুলো সঠিকভাবে কার্যকর থাকে না, ফলে ডিম্বাশয় ও প্যারিটনিয়ামের প্রদাহের জন্যে আক্রান্ত হাঁসটি মারা যায়। এসব অংশ থেকে সংক্রমণ নিম্নগামী যোনি ও অবসারনিকে সংক্রমিত করে এবং সেখানে চুলকানির ফলে অবসারনিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ডিম্বাশয় থেকে বিকৃত ডিম ডিম্ববাহি নালীতে জমা হতে থাকে এবং কুসুমগুলো জমে পূঁজের মত হলেও কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এ জাতীয় হাঁসের ডিম তা দিলে ডিমের ভেতরে ভ্রুণের মৃত্যু হতে পারে অথবা বাচ্চা ফোটার পর পরই মারা যেতে পারে।



চিত্রঃ ৩.৬ ডিম্বাশয়ের প্রদাহ রোগের লক্ষণ

কুসুম থলে সংক্রমণ রোগ

ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার পর প্রথম ৩ থেকে ৪ দিন বয়সে কুসুম থলে সংক্রমণের জন্যে মারা যায়। এ অবস্থাকে ব্যাখ্যা করার জন্যে নাভীর সংক্রমণ অথবা ওম্ফালাইটিস উপসর্গ নামে অবহিত করা হয়ে থাকে। একে অনেকে **"মাসি চিক ডিজিজ"** বলা হয়ে থাকে। হাঁসের ডিম তা দিলে ডিমের ভেতরে ভ্রূণের মৃত্যু হতে পারে অথবা বাচ্চা ফোটার পর পরই মারা যেতে পারে।



চিত্রঃ ৩.৭ কুসুম থলে সংক্রমণ রোগের লক্ষণ

ওম্ফালাইটিস

ওম্ফালাইটিস বা নাড়ির প্রদাহ, কুসুম থলের সংক্রমণ, মাসি চিক ডিজিজ এসব রোগের কারণে হাঁসের বাচ্চা ৩-৪ দিন বয়সে মারা যেতে পারে। কুসুম থলের সংক্রমণ রোগ অণুজীবাণু দ্বারা হয়ে থাকে তবে এ জাতীয় সংক্রমণ থেকে বোঝা যায় যে,

ক) প্রজনন খামারটির ব্যবস্থাপনা ছিল নিম্নমানের এবং
খ) হ্যাচারির ব্যবস্থাপনা ত্রুটিপূর্ণ ছিল।



চিত্র: ৩.৮ ওম্ফালাইটিস রোগের লক্ষণ

রোগের কারণ : খামার পরিবেশে এবং হাঁসের অন্ত্রে অনেক ধরনের রোগ অণুজীবি অবস্থান করে সেগুলো ও কুসুম থলে সংক্রমণসহ এ রোগ সৃষ্টি করতে পারে। ই-কলাই ছাড়া অন্যান্য যে সব রোগ অনুজীবাণু উপস্থিত থাকে যথা ব্যাসিলাস অরিয়াস, স্টেফাইলোকোক্কাই, সিউডোমোনাস, ক্লস্ট্রিডিয়া এবং প্রোটিয়াস ।
ওম্ফালাইটিস রোগের মহামারি ডিমের খোসার সংক্রমণ থেকে হয়ে থাকে। বিষ্ঠার মধ্যে বিদ্যমান এসব ব্যাকটেরিয়া ডিমের খোসার ছিদ্র পথে ভেতরে প্রবেশ করে ডিমকে সংক্রমিত/ কলুষিত করে থাকে।

হ্যাচারিতে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ না করলে অনেক রোগ অণুজীব তা বসানো ডিমকে সংক্রমিত করে, ফলে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটা বিলম্ব ঘটে এবং অধিকাংশ বাচ্চার নাভির ক্ষত শুকাতে দেরি হয়ে যায় ফলে স্বাভাবিকভাবেই এ ক্ষতের মাধ্যমে পরিবেশে বিদ্যমান রোগ অণুজীবাণু বাচ্চার পেটের মধ্যে অবস্থিত ডিমের কুসুমকে সংক্রমিত করে থাকে। সংক্রমিত নাড়িভুঁড়ি নাভির ক্ষতের মাধ্যমে অনেক সময় বের হয়ে আসে এবং নাভির ক্ষতকে মারাত্মকভাবে সংক্রমিত করতে পারে। কুসুম থলে সংক্রমণের ৩-১০% হাঁসের বাচ্চা জীবনের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যায় এবং মৃত্যুর হার বাড়তে পারে।

রোগ বিস্তার:

ডিমের কুসুম রোগ অণুজীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার ফলে কুসুমে পচন ধরে এর ফলে বাচ্চাটি ডিমের কুসুম থেকে যে পুষ্টি পাওয়ার কথা ছিল তা থেকে বঞ্চিত হয়। তথায় উপস্থিত কোনো কোনো রোগজীবাণু টক্সিন তৈরি করে। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত অবস্থায় এ টক্সিনের জন্যে টক্সিমিয়া সৃষ্টি হয় (রক্তের সাথে টক্সিন মিশে যায়) এবং ই- কলাই সংক্রমণ সেখানে প্রাধান্য থাকে।

স্টেফাইলোকক্কাস ও সিউডোমোনাস-এর উপস্থিতিতে আক্রান্ত বাচ্চার গোড়ালির শিরায় প্রদাহের সৃষ্টি হয়। গিড়া ফুলে যায়, বাচ্চা খোড়াতে থাকে।

রোগের লক্ষণসমূহ:

- এ রোগে আক্রান্ত বাচ্চা হ্যাচারি থেকে আনার সময় বাক্সেই মারা যেতে পারে।
- এ রোগে মৃত বাচ্চাটির পেট ভেজা থাকে, দুর্গন্ধ ও ময়লাযুক্ত থাকে।
- নাভি থেকে দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ বের হতে থাকে।
- এ রোগে মৃত অনেক বাচ্চা বিবর্ণ/নীল বর্ণের হয়ে যায়।
- পেটে কুসুমের থলে পচে যাওয়ার ফলে অনেক সময় তা বড় হয়ে যায় এবং এ জাতীয় বাচ্চার পেট বড় দেখায়।
- নাভির চারদিকে চামড়া ভেজা থাকে, ফোলা থাকে এবং লালচে দেখায়।
- ডিম ফোটানো যন্ত্রে যদি আর্দ্রতা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তা হলে নাভির ক্ষত শুকাতে বেশি সময় লাগে।
- নাভির এ ক্ষতের মাধ্যমে পেটের বিভিন্ন অঙ্গ বের হয়ে আসতে পারে।

রোগের চিকিৎসা:

এ রোগের আক্রান্ত বাচ্চাকে ১ দিন বয়স থেকে চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায় তবে পেরিটুনাইটিস এবং হৃৎপিন্ডের প্রদাহ হয়ে গেলে চিকিৎসায় কোনো ফল পাওয়া যায় না। একদিন বয়স থেকেই আক্রান্ত বাচ্চার ঘরের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়িয়ে দিতে হবে এবং সাথে সুষম খাদ্য ও পানির সাথে খাওয়াতে হবে।

রোগ দমন:

- স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পালিত ও পারিচালিত তেমন খামার থেকে বাচ্চা হাঁস সংগ্রহ করতে হবে।
- বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ডিম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাতে হবে।
- ইনকিউবেটরের মধ্যে বাচ্চা যাতে এ রোগ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- এ রোগ অণুজীবাণু খামারের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ কলুষিত করতে না পারে সে দিকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- অস্বাভাবিক অবস্থা ও পরিবেশ থেকে হাঁসকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যেমন-ঠান্ডা লাগা অথবা খামারে যাতে অধিক অ্যামোনিয়া গ্যাস সৃষ্টি হতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- যে সব রোগ হলে এ রোগ অণুজীবাণু ক্ষতি করার সুযোগ পায় সেসব রোগ যাতে না হয় সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- আক্রান্ত ঝাঁকের হাঁসকে প্রয়োজনীয় তাপে বা গরমে রাখতে হবে এবং পরিমিত আমিষ ও খাদ্যপ্রাণ সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- ধুলোবালির সাথে ই- কলাই রোগ অণুজীবাণু খামারে প্রবেশ করে। তাই ধুলোবালি যাতে খামারে প্রবেশ করতে না পারে এবং প্রচুর আলো বাতাস চলাচল করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।
- ইঁদুর/চিকা এ জাতীয় প্রাণির বিষ্ঠা হাঁসের খাবার ও পানিকে এ রোগের অণুজীবাণু দ্বারা কলুষিত করে। তাই এ জাতীয় প্রাণী যাতে হাঁসের খাদ্য গুদামে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- ❖ ইনকিউবেটরের মধ্যে যদি ডিম ভেঙে যায় তা হলে জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে তা রোগ জীবাণু মুক্ত করতে হবে।
- ❖ প্রতিবার নতুন ঝাঁক খামারে তোলার আগে খামারকে অবাঞ্ছিত পদার্থমুক্ত ও রোগ জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- ❖ সঠিক টিকাদান কর্মসূচি অনুসরণ করতে হবে।
- ❖ প্রতিদিন সকাল বিকাল হাঁসের সুস্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে। অসুস্থ হাঁস দেখা গেলে সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

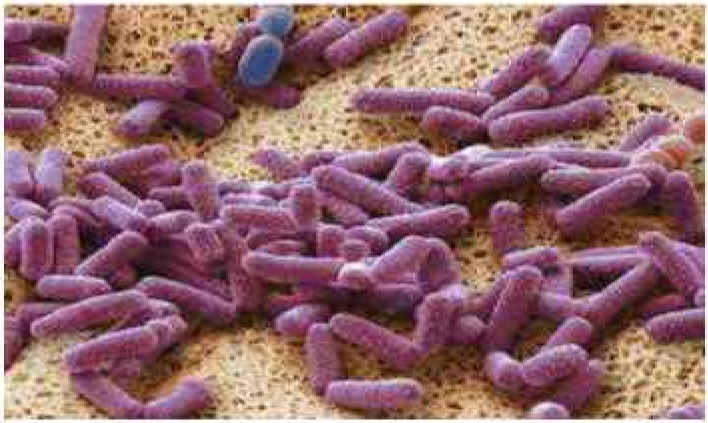
- কলিবেসিলোসিস রোগ বলতে কী বোঝায়?
- ওম্ফালাইটিস রোগে রোগাক্রান্ত হাঁসের বাচ্চা তুমি কীভাবে চিহ্নিত করবে?
- ই-কলাই ব্যাকটেরিয়া কোন পরিবেশে বংশ বিস্তার করে?
- কলিবেসিলোসিস রোগ দমনের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে?

ডাক কলেরা (Duck Cholera)

হাঁসের কলেরা একটি মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমক রোগ। উচ্চ আক্রান্ত ও উচ্চ মৃত্যু হার এবং ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট। সব বয়সের হাঁস এতে আক্রান্ত হতে পারে। হাঁসের ঘর স্বাস্থ্যসম্মত না হলে এবং ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি থাকলে এ রোগ মড়ক আকারে দেখা দেয়। সঠিকভাবে রোগ সনাক্ত করে চিকিৎসা করতে না পারলে মৃত্যু হার অনেক বেড়ে যায়। এছাড়া এ রোগ একবার দেখা দিলে দমন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

হাঁসের কলেরা রোগের কারণ:

পাশ্চুরেলা মাল্টুসিডা নামক এক প্রকার গ্রাম নেগেটিভ ক্ষুদ্র দন্ডাকৃতির বাইপোলার ব্যাকটেরিয়া এ রোগের একমাত্র কারণ।



চিত্র: ৩.৯ পাশ্চুরেলা মাল্টুসিডা ব্যাকটেরিয়া

হাঁসের কলেরা রোগের সংক্রমণ:

হাঁসের কলেরা রোগ নিম্নলিখিতভাবে সংক্রমিত হয়-

- সংবেদনশীল হাঁসের ঘরে কোন বাহক হাঁস থাকলে বা প্রবেশ করলে।
- বন্য পাখি বা অন্যান্য বাহক প্রাণির সংস্পর্শে সংবেদনশীল হাঁস আসলে।
- একই ঘরের বা খামারের এক ঘর থেকে অন্য ঘরে নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ সংক্রমিত হয়।
    - আক্রান্ত হাঁসের নাকের ছিদ্রের মাধ্যমে।
    - এ রোগে মৃত হাঁসকে ঠোকর দিলে।
    - কলুষিত পানির মাধ্যমে।
    - মানুষের জামা, জুতো, ঘরের ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি, টিকা প্রদানের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মাধ্যমে।
    - কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে আক্রান্ত হাঁস থেকে সুস্থ হাঁসে।

রোগের লক্ষণ:

- ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়।
- দেহের তাপমাত্রা বেশি থাকবে।
- হাঁস পানি পিপাসা বোধ করবে এবং হঠাৎ মারা যাবে।
- সবুজ ও পাতলা পায়খানা করবে।
- মুখ থেকে লালা পড়তে থাকে।
- পাখা নিচে নেমে যায়।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।

২০২৫



চিত্র : ৩.১০ হাঁসের কলেরা রোগের লক্ষণ

রোগ নির্ণয়:

নিম্নলিখিতভাবে হাঁসের কলেরা রোগ নির্ণয় করা যায়।

- ❖ রোগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- ❖ ময়না তদন্তে বিভিন্ন অঙ্গের প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে।
- ❖ অন্ত্রের রক্তক্ষরণ দেখে।
- ❖ যকৃতে ছোট ছোট সাদা দাগ।
- ❖ হৃৎপিন্ডের বাহিরের সাদা অংশে রক্তের ফোঁটা।
- ❖ মৃত হাঁসের সমস্ত অঙ্গে রক্তক্ষরণ ও রক্তাধিক্য।
- ❖ গবেষণাগারে জীবাণু কালচার করে ।



চিত্রঃ ৩.১১ যকৃতে ছোট ছোট সাদা দাগ

চিকিৎসা:

কলেরা রোগের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেলামাইড গ্রুপের ঔষধ উল্লেখিত মাত্রায় প্রয়োগ করে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়।

১. ফ্লুমেকুইন ১০% পাউডার ১ গ্রাম ২ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫দিন আক্রান্ত হাঁসকে পান করাতে হবে।

২. ফ্লুমেকুইন ২০% সলুশন ১ মিমি/৪ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫দিন আক্রান্ত হাঁসকে পান করাতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ

কলেরা রোগ প্রতিরোধে নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়

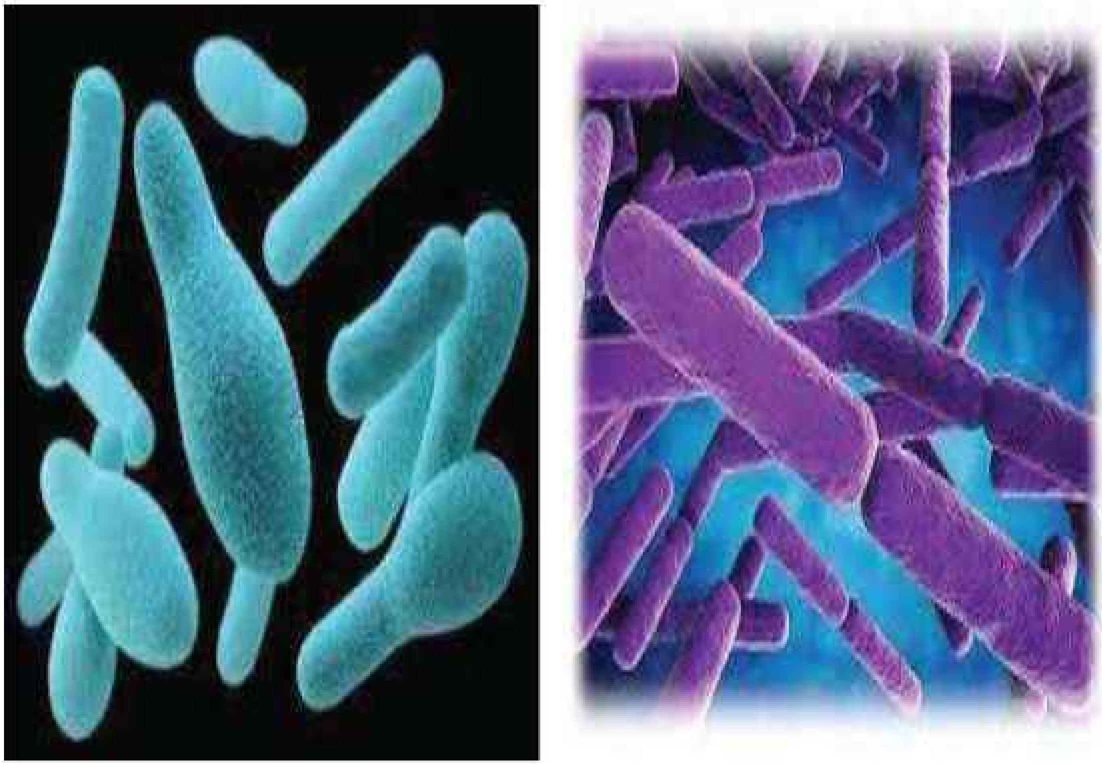
- খামার ব্যবস্থাপনা সব সময় খামারের আশেপাশে জীবাণুনাশকের ব্যবহার বাড়ানো।
- লোকজনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা।
- এক ঘরের যন্ত্রপাতি অন্য ঘরে নেয়ার সময় জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।
- খামারে জৈব নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে।

হাঁসের বটুলিজম রোগ

হাঁসের বটুলিজম রোগ একটি মারাত্মক অসংক্রামক রোগ। এ রোগ অণুজীবাণু সরাসরি রোগ সৃষ্টি করে না। এটি মৃত পঁচা গাছ, লতাপাতা কাদামাটিতে বাস করে এবং যে সব স্থানে বাতাস চলাচল করে না অথচ পঁচা জৈব পদার্থ রয়েছে সেখানে এ রোগ অণুজীবাণু বংশবৃদ্ধি ও টক্সিন তৈরি করতে পারে। মৃতদেহে জন্মানো পোকা, মাছির শুককীট প্রভৃতি খেয়েও হাঁস এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। হাঁসে এ রোগ অণুজীবের যে টক্সিনটি রোগ সৃষ্টি করে তা মানুষের মাঝে রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

রোগের কারণ: ক্লোস্ট্রেডিয়াম বটুলিনাম নামক রোগ অণুজীবের টক্সিন এ রোগের জন্য দায়ী। রোগ অণুজীবাণুটি নিজে নয় বরং এ রোগ অণুজীবাণু দ্বারা তৈরি টক্সিন টাইপ সি এ রোগের জন্য দায়ী।

২০২৫



চিত্র ৩.১২ ক্লোস্ট্রেডিয়াম বটুলিনাম জীবাণু

খামারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে হাঁস পালন করা হলে এ রোগ হতে পারে না। হাঁস যেভাবে আক্রান্ত হতে পারে সেগুলো হচ্ছে:

- ❖ এ রোগের টক্সিন দ্বারা কলুষিত খাদ্য।
- ❖ এ রোগের টক্সিন দ্বারা কলুষিত পানি।
- ❖ মৃতদেহ খেলে।
- ❖ মৃতদেহে জন্মানো পোকা বা পোকার শুককীট খেলে।

হাঁসের বটুলিজম রোগের সংক্রমণ

হাঁসের খাদ্য বা পানির সাথে এ টক্সিন দেহে প্রবেশ করে স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। ফলে অবসাদজনিত উপসর্গ দেখা যায়। শ্বসনযন্ত্রের অবশতার জন্য আক্রান্ত হাঁস মারা যায়। কাদাযুক্ত পানিতে হাঁস ছাড়া হলে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ রোগের টক্সিন দ্বারা আক্রান্ত হবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে এমন কি কোনো প্রকার লক্ষণ প্রকাশ না করেই ঝাঁকের অনেক হাঁস মারা যেতে পারে।

২০২৫

হাঁসের বটুলিজম রোগের লক্ষণ

- এ রোগের টক্সিন খাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অবশ্য এটি নির্ভর করে কি পরিমাণ টক্সিন আক্রান্ত হাঁসটি খেয়েছে তার উপর।
- ঝিমায়, দূর্বল হয়ে পড়ে, হাঁটতে পারে না। হাঁটতে গেলে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যায়।
- পাখা, পা, গলা অবশ হয়ে যায়, তখন পাখা ছড়িয়ে গলা সোজা করে লম্বা হয়ে মেঝেতে শুয়ে থাকে এ অবস্থায় অনেক সময় পালক টানলে সহজেই উঠে আসে। এ লক্ষণগুলো হাঁস পানিতে থাকাকালীন দেখা দিলে হাঁস ডুবে মারা যায়।
- অল্প পরিমাণে টক্সিন খেলে হাঁস ঠিকমত হাঁটতে পারে না এবং আর টক্সিন খাবার সুযোগ না থাকলে তা হলে কয়েকদিন যাবার পর আরোগ্য লাভ করে।



চিত্র: ৩.১৩ হাঁসের বটুলিজম রোগের লক্ষণ

ময়না তদন্তের প্রাপ্ত ফলাফল

এ রোগে মৃত হাঁসের ময়না তদন্তে তেমন মারাত্মক কোনো ক্ষতচিহ্ন দেখা যায় না তবে যে সব অস্বাভাবিকতা দেখা যেতে পারে সেগুলো হচ্ছে-

- খাদ্যনালি ও পাকস্থলিতে কোনো খাদ্য থাকে না।
- যকৃত ও বৃক্ক বড় হতে পারে এবং কালচে বর্ণের দেখায়।

রোগ নির্ণয়

- রোগের ইতিহাস দেখে
- রোগের লক্ষণ দেখে
- ময়না তদন্তের উপর ভিত্তি করে
- গবেষণাগারে এ রোগের টক্সিন নির্ণয় করে
- সিকাম ও যকৃত থেকে এর রোগজীবাণু পৃথক ও শনাক্তকরনের মাধ্যমে।

রোগ দমন:

- ❖ মৃত হাঁস ঘর থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে।
- ❖ প্রচুর পরিষ্কার পানি খেতে দিতে হবে।
- ❖ হাঁসকে কাদা বা ময়লা পানিতে সাঁতার কাটা বন্ধ করতে হবে।
- ❖ বিছানায় যাতে পোকা জন্মাতে না পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ❖ খামার এলাকায় যেন কোনো পচা জৈব পদার্থ না থাকে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ❖ যে সব নদীনালা, পুকুর, হাওর-বাওড়ে রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেখানে হাঁস চরানো যাবে না।
- ❖ শুঁটকি ও প্রাণিজ আমিষ খাদ্য ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- হাঁসের ব্যাকটেরিয়াজনিত দু'টি রোগের নাম লেখো।
- হাঁসের কলেরা রোগের লক্ষণ লেখো।
- কীভাবে হাঁসের বটুলিজম রোগ সনাক্ত করবে?
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ দমনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো লেখো।

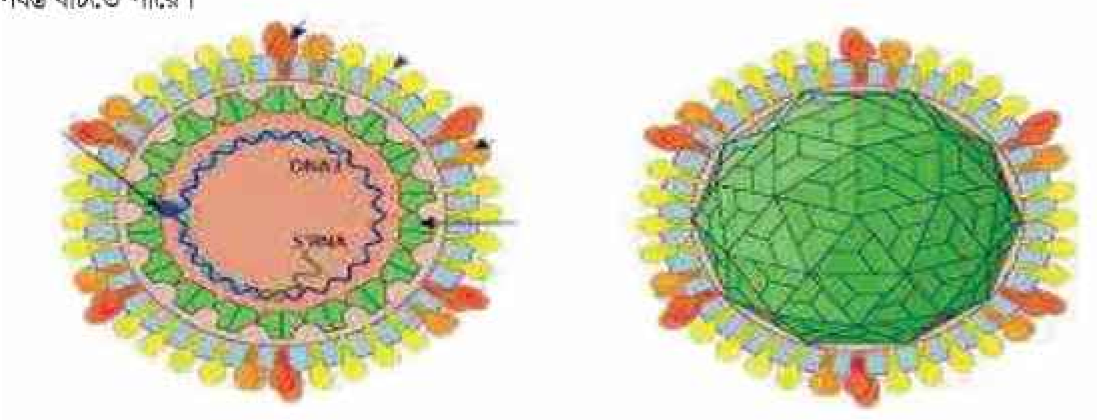
হাঁসের ভাইরাসজনিত রোগসমূহ

ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস

এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। হাঁসের বাচ্চার ক্ষেত্রে একটি তীব্র ছোঁয়াছে রোগ। একে যকৃত প্রদাহ রোগ বলা হয়ে থাকে। চার সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চার ক্ষেত্রে এ রোগ দেখা দেয়।

রোগের কারণ:

পিরোরনা নামক এক প্রকার ভাইরাস এ রোগের কারণ। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এ ভাইরাস ৭ থেকে ২৯ দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে।



চিত্র : ৩.১৪ ডাক হেপাটাইটিস রোগের ভাইরাস

রোগ ছড়ানোর মাধ্যম

আক্রান্ত খামারের বা ঝাঁকের সব বাচ্চা আক্রান্ত হতে পারে। এ কারণে রোগের সুপ্তিকাল কয়েক ঘন্টা মাত্র। যেসব মাধ্যমে বাচ্চা আক্রান্ত হতে পারে সেগুলো হচ্ছে

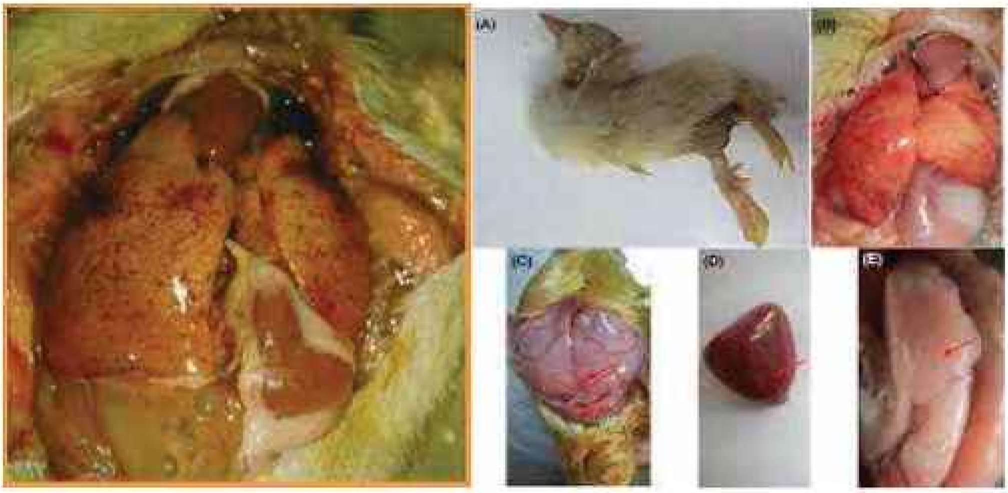
- খাদ্য ও পানির মাধ্যমে।
- এ রোগের ভাইরাস দ্বারা কলুষিত দ্রব্যের মাধ্যমে।
- আক্রান্ত হাঁসের সংস্পর্শে আসলে।
- আক্রান্ত হাঁসের মলের মাধ্যমে।

রোগের লক্ষণ

- আক্রান্ত হাঁসের বাচ্চাগুলো খাওয়া বন্ধ করে দেয়।
- বাচ্চাগুলো স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করে না। আস্তে আস্তে চলাফেরা করে। চোখ বন্ধ করে রাখে।
- স্বাভাবিকভাবে চলতে না পেরে একদিকে কাত হয়ে পড়ে যায়।
- লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ১ (এক) ঘন্টার মধ্যেই মারা যেতে পারে।
- রোগে মৃত হাঁসের বাচ্চাকে ময়নাতদন্ত করে যকৃতের নানা বর্ণের ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায়। যকৃত বড় হয় এবং ফ্যাকাসে দেখা যায়।
- এ রোগে মৃত্যুর হার ৫-৯৫% হতে পারে।



চিত্র : ৩.১৫ ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস রোগের লক্ষণ



চিত্র : ৩.১৬ ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস রোগের ময়নাতদন্তের লক্ষণ

চিকিৎসা: রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ডাক হেপাটাইটিস এন্টিসিরাম ০.৫ সি.সি. পরিমাণ প্রতি হাঁসের ছানার মাংসপেশিতে ইনজেকশন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

রোগ দমন:

- ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী হাঁসের বাচ্চাকে টিকা দিতে হবে।
- বয়স্ক হাঁসের সাথে বাচ্চা হাঁস রাখা উচিত নয়।
- ইঁদুর ও বন্য হাঁস এ রোগের ভাইরাস ছড়াতে পারে, তাই এগুলো যাতে খামারে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। অর্থাৎ বায়োসিকিউরিটি সঠিকভাবে বজায় রাখতে হবে।

ডাক প্লেগ

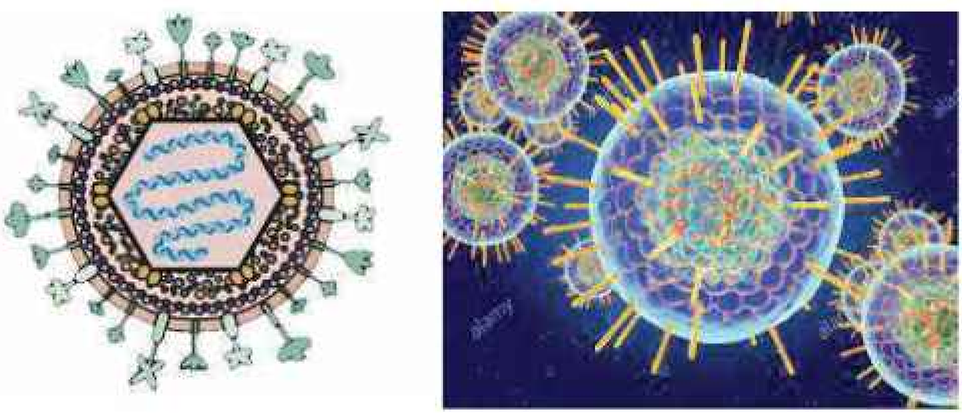
এ রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াছে রোগ। এ রোগকে অন্ত্রের প্রদাহ রোগ বলা হয়ে থাকে। হাঁস, বাচ্চা হাঁস ও অন্যান্য বন্য হাঁস এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সাধারণত বয়স্ক হাঁস এ রোগে বেশী আক্রান্ত হয়ে থাকে।



চিত্রঃ ৩.১৭ ডাক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হাঁস

ডাক প্লেগ রোগের কারণঃ

হারপেস গোত্রভুক্ত ডাক হারপেস ভাইরাস -১, অ্যানাটিড হারপেস ভাইরাস -১, এ রোগের কারণ। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এ ভাইরাস সাধারণত ৩০ দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে।



চিত্রঃ ৩.১৮ হারপেস গোত্রভুক্ত ডাক হারপেস ভাইরাস

রোগ ছড়ানোর মাধ্যম

- আক্রান্ত ফ্লকের খাদ্য ও পানির মাধ্যমে।
- আক্রান্ত হাঁসের সংস্পর্শে আসলে।
- আক্রান্ত অন্য হাঁসের মাধ্যমে এ ভাইরাস ছড়াতে পারে।

লক্ষণ

- ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়।
- পিপাসা বেড়ে যায় এবং বার বার পানি খেতে দেখা যায়।
- আক্রান্ত হাঁস ঝিমাতে থাকবে এবং পালক উসকো খুসকো হবে।
- চোখ ও নাক দিয়ে তরল পানি নিঃসৃত হবে।
- ডিম পাড়া হাঁসির ডিম পাড়া কমে যায়।
- পুরুষ হাঁসের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বের হয়ে যায়।
- ঠোঁট নীল বর্ণ ধারণ করে।
- ঘন সবুজ-হলুদ রঙের পাতলা পায়খানা করে এবং লেজের আশেপাশে মল লেগে থাকে।
- ঘাড় বাঁকা করে উপর দিকে চেয়ে থাকে।



চিত্রঃ ৩.১৯ পুরুষ হাঁসের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বের হয়ে যায়।



চিত্র: ৩.২০ ঘাড় বাকা করে উপর দিকে চেয়ে থাকে।

রোগ দমন

- আক্রান্ত হাঁসের কোনো চিকিৎসা নেই।
- খামারে যাতে এ রোগ ঢুকতে না পারে সে দিকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- আক্রান্ত হাঁস আলাদা করতে হবে।
- হাঁসের ঘরের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও লিটারগুলো জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।
- হাঁসকে নিয়মিত ডাক প্লেগ টিকা প্রয়োগ করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- খামারের জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- হাঁসের ভাইরাসজনিত দু'টি রোগের নাম লেখো।
- হাঁসের প্লেগ রোগের লক্ষণ লেখো।
- কীভাবে হাঁসের হেপাটাইটিস রোগ সনাক্ত করবে?
- ভাইরাসজনিত রোগ দমনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো লেখো।

হাঁসের ছত্রাক রোগ

আক্রান্ত অঙ্গের উপর ভিত্তি করে হাঁসের ছত্রাক রোগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :

ক) আন্ত্রিক অঙ্গের সংক্রমণ, যথা- ব্রুডার নিউমোনিয়া

খ) চর্ম অঙ্গের সংক্রমণ - ফেভাস

গ) পরিপাকতন্ত্রের সংক্রমণ- ক্যানডিডিয়াস

অ্যাসপারজিলোসিস বা ব্রুডার নিউমোনিয়া

এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগকে ব্রুডার নিউমোনিয়াও বলা হয়ে থাকে। ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে এ রোগ বেশি হয়ে থাকে। আন্ত্রিক অঙ্গের সংক্রমণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অ্যাসপারজিলোসিস রোগ। ব্রুডার নিউমোনিয়া বলতে ফুসফুস ও বাতাসের থলে সংক্রমণকে বুঝায়। এ রোগ সাধারণত শ্বাসতন্ত্রকে আক্রান্ত করে, তবে মাঝে মাঝে যকৃত, চোখ, মস্তিষ্ক এমন কি অন্যান্য অঙ্গকেও আক্রান্ত করতে পারে।

যে সব প্রাণী এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে সেগুলো হচ্ছে হাঁস, মুরগি, টার্কি ও অন্যান্য পোষা পাখি। মানুষের মাঝেও এ রোগ ছাড়াতে পারে। অল্প বয়স্ক হাঁস, মুরগি এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। বাড়ন্ত বা বয়স্ক হাঁস আক্রান্ত হতে পারে তবে এদের মৃত্যুর হার কম।

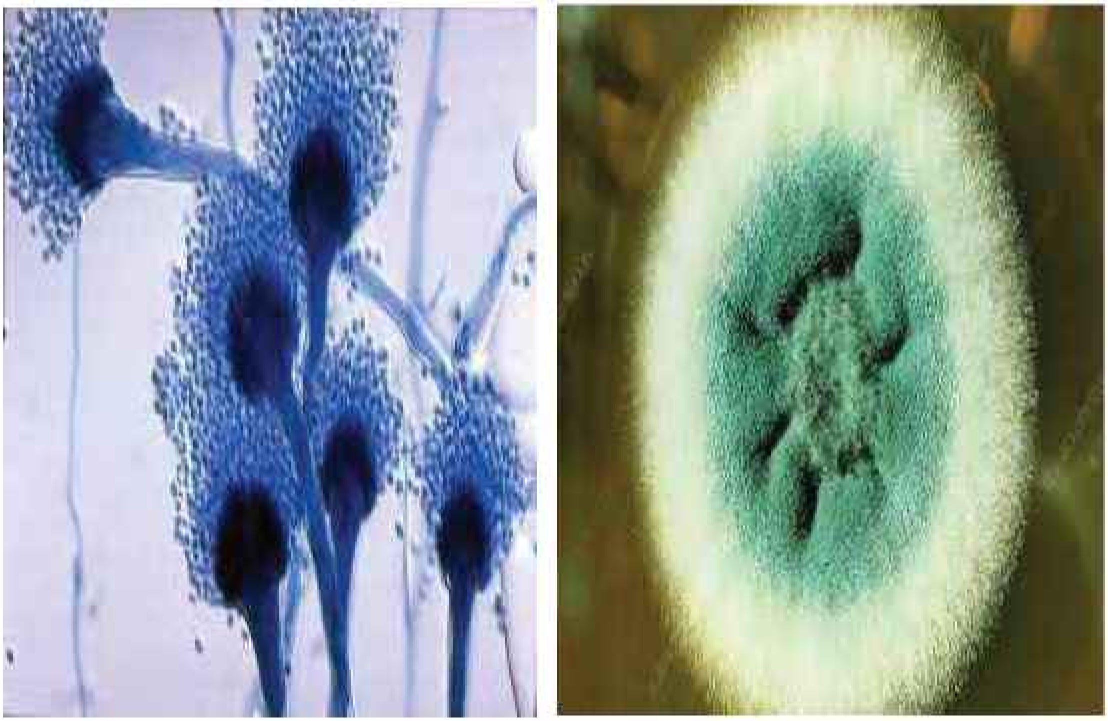
যেসব ছত্রাক এ রোগের জন্য দায়ি সেগুলো হচ্ছে

- অ্যাসপারজিলাস ফিউমিগেটাস
- অ্যাসপারজিলাস গ্লেকাস
- অ্যাসপারজিলাস নাইগার
- অ্যাসপারজিলাস ফ্লেভাস

রোগের কারণ

অ্যাসপারজিলাস ফিউমিগেটাস নামক ছত্রাক হাঁসের ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে এ রোগের কারণ।

২০২৫



চিত্রঃ ৩.২১ অ্যাসপারজিলাস ফিউমিগেটাস ছত্রাক

যে সব অবস্থা এ রোগ সৃষ্টি করে বা সুযোগ করে দেয় সেগুলো হচ্ছে :

- ❖ ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ 'এ' এর অভাব
- ❖ স্বাস্থ্যহীনতা
- ❖ স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া
- ❖ গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া
- ❖ অপ্রতুল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা
- ❖ ছত্রাক কলুষিত কক্ষে আবদ্ধ করে রাখা
- ❖ স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ
- ❖ ভেজা বিছানা (লিটার)
- ❖ পরিত্যক্ত খাদ্য উপাদান ছত্রাকের বংশবৃদ্ধির বাহক হিসেবে কাজ করে
- ❖ পুলোরাম রোগ।

অ্যাসপারজিলোসিস রোগের সংক্রমণঃ

- ❖ খামারে বা ঝাঁকে বিদ্যমান উপরোক্ত ছত্রাকের স্পোরগুলো শ্বাসের সাথে দেহে প্রবেশ করে।
- ❖ এসব স্পোর চোখের ঝিল্লিকে আক্রান্ত করতে পারে।
- ❖ ডিম ফোটানোর যন্ত্র এসব ছত্রাকে কলুষিত থাকলে বাচ্চাতে এ রোগ ছড়াতে পারে।

- যে বাক্স দিয়ে বাচ্চা বহন করা হয় তা যদি এসব ছত্রাক দ্বারা কলুষিত থাকে তা হলে এ সব বাচ্চাকে আক্রান্ত করতে পারে।
- ডিমের খোসা ভেদ করে এসব ছত্রাক খোসার ভেতরে প্রবেশ করতে পারে এবং তাতে ভ্রূণের মৃত্যু হতে পারে অথবা বাচ্চাতে এ রোগ ছড়াতে পারে।
- এসব ছত্রাকের স্পোর খাদ্য বা পানির সাথে দেহে প্রবেশ করতে পারে।

অ্যাসপারজিলোসিস বা ব্রুডার নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণসমূহ

এ রোগে সাধারণত অল্প বয়স্ক হাঁসের বাচ্চা আক্রান্ত হয়ে থাকে। ডিম ফোটানোর যন্ত্র থেকে যদি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে তা হলে ২-৩ দিন বয়সে এবং ব্রুডার থেকে আক্রান্ত হলে ৫-৬ দিন বয়সে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত ঝাঁকের শতকরা ৫০ ভাগ বাচ্চা মারা যেতে পারে।

- শ্বাসকষ্ট, হাঁ করে শ্বাস নেয়া, এসব লক্ষণ সংক্রামক ব্রংকাইটিস বা লেরিংগো ট্রাকিয়াইটিস রোগ দেখা যেতে পারে, তবে এ রোগে শ্বাস নেয়ার সময় গড় গড় শব্দ হয় না যা অন্য রোগে হয়ে থাকে।
- আক্রান্ত হাঁস ঝিমায়।
- খাওয়া বন্ধ করে দেয়।
- পিপাসা বেড়ে যায়।
- দুর্বল হয়ে যায়।
- দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারে না অর্থাৎ স্নায়ুবিক দুর্বলতা দেখা দেয়।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাতলা পায়খানা হতে পারে।
- লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত হাঁস মারা যায়।

বয়স্ক হাঁস আক্রান্ত হলে শ্বাসকষ্টে ভোগে। মনে হয় গলায় কিছু আটকে গিয়েছে। দ্রুত স্বাস্থ্যহানি ঘটে। হাঁটতে গেলে দুর্বল মনে হয় এবং পড়ে যায়। পাতলা পায়খানা হতে পারে। শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়।

এ রোগের কারণে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার হার কমে যায়। ভ্রূণ অবস্থায় অত্যধিক মারা যায়। এ সব ডিমের ভেতরের বাতাসের থলেতে সবুজ বর্ণের ছত্রাকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

চোখ আক্রান্ত হলে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেগুলো হচ্ছে:

- চোখে প্রদাহ দেখা দেয়।
- চোখ ফুলে যায়।
- চোখ দিয়ে সব সময় পানি পড়ে এবং চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়।
- চোখের ভিতর সাদা পূঁজ জাতীয় পদার্থ থাকে।
- চোখ চুলকাতে থাকে।
- চোখের কর্ণিয়াতে ঘা হতে পারে
- চোখ পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

চামড়া আক্রান্ত হলে-

মরা চামড়া বা খুসকিযুক্ত হলুদ বর্ণের ক্ষত দেখা যায়।

মস্তিষ্ক আক্রান্ত হলে-

সঠিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না। স্নায়ুবিক লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়ে অবশ হয়ে যেতে পারে।

এ সব ছত্রাক যে সব টক্সিন তৈরি করে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে-

- ❖ আফ্লাটক্সিন- যকৃতকে নষ্ট করে।
- ❖ হিমোটক্সিন- রক্তকণিকাকে নষ্ট করে।
- ❖ নিউরোটক্সিন- স্নায়ুতন্ত্রকে নষ্ট করে।




চিত্রঃ ৩.২২ শ্বাসকষ্ট, হাঁ করে শ্বাস নেয়া

ময়না তদন্তের ক্ষত চিহ্ন

- ❖ কণ্ঠ ও শ্বাসনালীতে এবং ফুসফুসে ক্ষত দেখা যায়।
- ❖ ফুসফুসের বায়ু থলেতে বিভিন্ন আকারে হলুদ বর্ণের গুটি থাকতে পারে। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ফুসফুস এ সব গুটির জন্য শক্ত হয়ে যায়। গুটিগুলো অনেকটা কাউনের দানার মতো।
- ❖ ফুসফুসে বা বায়ু থলেতে বাতাসের আকৃতির নরম তুলোর মতো সবুজ বর্ণের ক্ষত চিহ্ন দেখা যেতে পারে।
- ❖ পেটের ভেতরে অন্যান্য ঝিল্লিতেও এ জাতীয় ক্ষত চিহ্ন দেখা যেতে পারে।



চিত্র ৩.২৩ অ্যাসপারজিলোসিস রোগের ফুসফুসে কাউনের দানার নডিউল

রোগ নির্ণয়

- ❖ রোগের লক্ষণাদি দেখে।
- ❖ ময়না তদন্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্ষত চিহ্ন দেখে।
- ❖ অ্যাসপারজিলোসিস ছত্রাক পৃথক ও শনাক্তকরণের মাধ্যমে।

রোগ দমন

- ❖ এ রোগে যাতে আক্রান্ত হতে না পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে কারণ এ রোগের ভালো চিকিৎসা নেই ।
- ❖ ডিম ফোটানোর যন্ত্র, বাচ্চা বহণ করার বাক্স, ব্রুডার প্রভৃতি ছত্রাকমুক্ত রাখতে হবে।
- ❖ ডিম ফোটানোর যন্ত্র, ব্রুডার, চিকগার্ড এসব ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিলে এ ছত্রাকের স্পোর থাকে না। এরপর ৯৯ ভাগ পানির সাথে এক ভাগ তুঁতে মিশিয়ে যে দ্রবণ তৈরি হয় তা দিয়ে ছত্রাক মারা যায়।
- ❖ হাঁসের ঘরে ব্যবহৃত বিছানা/লিটার যথা কাঠের গুড়ো, ধানের তুষ, খড়ের কুঁচি প্রভৃতি ধুলা বালিমুক্ত হতে হবে। চালুনি দিয়ে চেলে ধুলা বালি বাদ দেয়া যেতে পারে।
- ❖ বিছানা যাতে পানিতে ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে না হয়ে যায় সে দিকে সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বিছানা দেয়ার উদ্দেশ্যই হলো হাঁসের বিষ্ঠার সাথে বের হয়ে আসা পানিকে শুষে নিয়ে শুষ্ক অবস্থা নিশ্চিত করা। কারণ আমাদের দেশের আবহাওয়াতে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা ছত্রাকের বংশ বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত স্থান।

চিকিৎসা

- খাদ্যের সাথে সোডিয়াম প্রোপায়নেট বা জেনসেন ভায়লেট মিলিয়ে দিলে ছত্রাক বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।
- মাইকোস্টেটিন ২০০ গ্রাম প্রতি টন খাদ্যের সাথে মিশিয়ে ৭-১০ দিন খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। ৫০ গ্রাম প্রতি টন খাদ্যের সাথে সব সময় খাওয়ালে প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। টক্সিন বাইন্ডার ২ কেজি প্রতি টন খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে ৭(সাত) দিন। তুঁতে এক গ্রাম দুই লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১ দিন পর পর ৭ দিন খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।
- ক্রিস্টাল ভায়লেট ব্রিলিয়েন্ট, গ্রিন প্রভৃতির ব্যবহার মাঝে মাঝে সুফল দিয়ে থাকে।

হাঁসের মাইকোপ্লাজমোসিস রোগ

মাইকোপ্লাজমা এনাটিস নামক এক প্রকার মাইকোপ্লাজমা হাঁসে এ রোগ সৃষ্টি করে থাকে। আক্রান্ত হাঁসে এ রোগজীবাণু কয়েক সপ্তাহ থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত বাঁচতে পারে। হাঁসের দেহের বাইরে, খামার পরিবেশে এ রোগজীবাণু মাত্র কয়েক দিন বাঁচতে পারে। পেনিসিলিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিকস এ রোগজীবাণু ধ্বংস করতে পারে না। আক্রান্ত হাঁসের বিষ্ঠায় ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এ রোগজীবাণু তিনদিন এবং ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১৮ সপ্তাহ এবং ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

মাইকোপ্লাজমোসিস রোগের বিস্তার

- আক্রান্ত হাঁসের ডিম্বাশয় থেকে ডিমে, ডিম থেকে বাচ্চায়।
- আক্রান্ত হাঁসের শুক্রকীট থেকে ডিমে, ডিম থেকে বাচ্চায়।
- আক্রান্ত হাঁসের লালা/ শ্লেষ্মার সাথে মিশে সুস্থ হাঁসের শ্বাসের সাথে দেহে প্রবেশ করে।
- আক্রান্ত হাঁসের সাথে সুস্থ হাঁস রাখা হলে কিন্তু আক্রান্ত হাঁসের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মাধ্যমে সাধারণত এ রোগ ছড়ায় না, তবে আক্রান্ত হাঁসের সংস্পর্শে এসে অবাঞ্ছিত পশু পাখি যেমন ইঁদুর, তেলাপোকা, চড়ুই পাখি, কাক, বাজপাখি, মাছি এ রোগজীবাণু ছড়াতে পারে।

যেসব অবস্থা বা পরিবেশে রোগজীবাণুর ক্ষতিকর ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় সেগুলো হচ্ছে-

- অন্যান্য কারণে সৃষ্ট শ্বসনতন্ত্রের উপসর্গসমূহ।
- ভাইরাস আক্রান্ত হাঁসে টিকার ব্যবহার করলে।
- ঠান্ডা অবস্থা, খামারে অ্যামোনিয়া গ্যাসের উপস্থিতি।
- বিশুদ্ধ বাতাস চলাচলের অভাব। এ রোগের সুপ্তিকাল ৫-৬ দিন।

রোগের লক্ষণ

- যে কোনো বয়সের হাঁস এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে তবে বাচ্চা হাঁসে এ রোগ বেশি দেখা যায়।
- বয়স্ক হাঁসের নাক ও চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

২০২৬

- ❖ চোখে পুঁজের মতো পদার্থ জমা হয়।
- ❖ চোখ বন্ধ করে রাখে।
- ❖ গলায় গড় গড় শব্দ হয়।
- ❖ ডিম পাড়া হাঁসের ডিম উৎপাদনের হার কমে যায়।
- ❖ খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যায়।
- ❖ হালকা হয়ে যায় অর্থাৎ ওজন কমে যায়।
- ❖ সাধারণত বাচ্চা হাঁস ৪-৮ সপ্তাহ বয়সে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে।
- ❖ এ রোগে আক্রান্ত হাঁসের শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত মারা যেতে পারে।
- ❖ এ রোগে আক্রান্ত হাঁসের ডিম থেকে বাচ্চা ফোটালে অধিকাংশ ডিমের মধ্যে ভ্রূণ অবস্থায় বাচ্চা মারা যায়। ডিম ফোটার পর বাচ্চাতে এ রোগে সংক্রমিত হতে পারে।
- ❖ এ রোগে আক্রান্ত হাঁস খামারে পালন করা বিপদজনক ।

এ রোগে মৃত হাঁসের ময়না তদন্তের ক্ষতচিহ্ন

- ❖ নাকের ছিদ্র পথে, শ্বাসনালীতে প্রদাহ, কফ বা আঠালো পদার্থ থাকতে পারে।
- ❖ বায়ুথলেতে দুধের ছানার মতো হলুদ বর্ণের পদার্থ থাকতে পারে।
- ❖ বায়ুথলের আবরণটি পুরু হয়ে যেতে পারে।
- ❖ হৃৎপিন্ড ও যকৃতের উপরিভাগে পাতলা নরম আবরণ দেখা যায়।
- ❖ ডিম্বাশয় লাল বর্ণের হয়ে থাকে।

রোগ নির্ণয়

- ❖ আক্রান্ত হাঁসের বা ময়না তদন্তের ক্ষতচিহ্ন এ রোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।
- ❖ আক্রান্ত ঝাঁকের হাঁসের রক্তের সিরাম পরীক্ষার মাধ্যমে অথবা মৃত হাঁস বা ডিমের ভেতর মৃত ভ্রূণ থেকে এ রোগজীবাণু পৃথক ও শনাক্তকরণের মাধ্যমে এ রোগ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।
- ❖ বাচ্চা হাঁসের রক্তের সিরাম পরীক্ষা না করে এ রোগ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হবে।
- ❖ গবেষণাগারের ফলাফলের সাহায্যে রোগ নির্ণয় চূড়ান্তভাবে করা সম্ভব।
- ❖ শ্বাসনালী, বায়ুথলে, ফুসফুস, ডিমের ভেতরে মৃত ভ্রূণ প্রভৃতি নমুনা থেকে এ রোগের জীবাণু পৃথক করা যায়।

চিকিৎসা

ঔষধের নাম	মাত্রা	ব্যবহার বিধি
জেন্টামাইসিন ৫%	৫ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য	প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য মাংসে ইনজেকশন দিতে হবে। ১ম দিন ১২ ঘণ্টা অন্তর এর পর ২৪ ঘণ্টা অন্তর মোট ৩-৫ দিন।
এনরো ফ্লোকসিন	১০ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য	পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
টেট্রাসাইক্লিন ২৫%	১ গ্রাম	২ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে ৫ দিন।

২০১৫

রোগ দমন

- আক্রান্ত ঝাঁকের হাঁসগুলোকে চিকিৎসা করতে হবে।
- ভাইরাস রোগের টিকা মাইকোপ্লাজমামুক্ত এ নিশ্চয়তা কোম্পানি কর্তৃক দিতে হবে।
- যেসব টিকা হাঁসের ডিমের মাধ্যমে তৈরি হয় সেগুলো মাইকোপ্লাজমামুক্ত হাঁসের ডিম।
- আক্রান্ত ঝাঁকে হাঁসের রক্তের সিরাম পরীক্ষা করে রোগাক্রান্ত হাঁসগুলোকে প্রজনন খামার থেকে আলাদা করতে হবে।
- ডিম তা দেয়া কালে অধিক হারে ভ্রূণের মৃত্যু হলে, মৃত ভ্রূণ থেকে এ রোগ জীবাণু পৃথক করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- হাঁসের ছত্রাকজনিত দু'টি রোগের নাম লেখো।
- হাঁসের এসপারজিলোসিস রোগের লক্ষণ লেখো।
- মাইকোপ্লাজমোসিস রোগ দমনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো লেখো।

৩.৩ হাঁসের পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত রোগের নাম, কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

অপুষ্টিজনিত রোগ

খাদ্যের যে কোনো এক বা একাধিক খাদ্য উপাদানের ঘাটতির কারণে হাঁসের বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যাহত হয়, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। হাঁসের ভিটামিন সমূহের অভাবজনিত রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকারের বর্ণনা দেওয়া হলো–

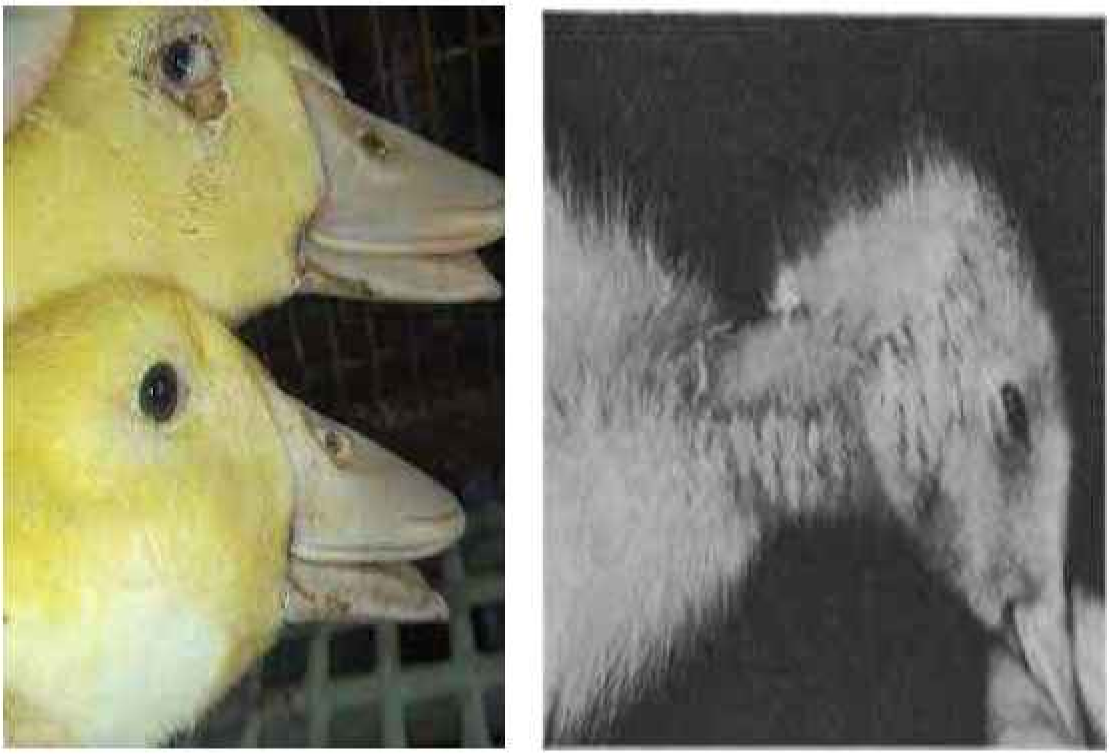
ক) ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ

ভিটামিন- এ

কতদিন পর্যন্ত হাঁসগুলো এই ভিটামিনের অভাবে ভুগছে তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিন-'এ' এর অভাবে সৃষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়। বয়স্ক হাঁসে লক্ষণ দেখা দিতে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে। কিন্তু বাচ্চা হাঁসে ২/৩ সপ্তাহের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভিটামিন-'এ' এর অভাবজনিত লক্ষণগুলো অবস্থা ও বয়সভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

অভাবজনিত লক্ষণ

- ❖ চোখের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায়, চোখের পাতা ফুলে যায়।
- ❖ নাক ও চোখ দিয়ে আঠার মতো জলীয় পদার্থ বের হয় এবং রাতকানা রোগ হয়।
- ❖ হাঁটু ও চামড়ার রং হলুদ ফ্যাকাশে হয়ে যেতে থাকে।
- ❖ খাবার গ্রহনে আগ্রহ কমে যায় ও পালকের চাকচিক্য কমে যেতে পারে।
- ❖ মাথার ঝুঁটি, গলার ফুল নীলাভ ও শুষ্ক হয়। ঝুঁটি শুষ্ক ও ফ্যাঁকাশে হয়ে যায়।
- ❖ বাচ্চার শারীরিক বৃদ্ধি কমে যায়।



চিত্র: ৩.২৪ ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত লক্ষণ

অভাব নিরূপণ

- ❖ খাদ্যে ভিটামিন এর পরিমাণ সঠিক আছে কি না তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা।
- ❖ রক্তের সিরামে ভিটামিন এর পরিমাণ নির্ণয় করা।

- ❖ চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায় কি না তা লক্ষ্য করার মাধ্যমে এই ভিটামিনের অভাবজনিত অবস্থা নিরূপণ করা যায়।

প্রতিকার ও চিকিৎসা

খাদ্যে এন্টি অক্সিডেন্ট ব্যবহার করা প্রয়োজন। শাকসবজি, ভুট্টা, গম, ছোট মাছ, ফলমূল, ফলমূলের খোসা, হাঙ্গর মাছের তৈল খাওয়ালে ভিটামিন-এ এর অভাব দূর হয়। লক্ষণ দেখা দিলে প্রতিদিন বাজারে প্রাপ্ত ভিটামিন এ.ডি.ই. দ্রবণ প্রস্তুতকারকের নির্দেশমত খাদ্য বা পানির সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ করতে হবে।

ভিটামিন ডি

শরীরের হাড় এবং ডিমের খোসার গঠনের জন্য অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস এর কার্যকারিতার জন্য এই ভিটামিন অত্যন্ত জরুরি। সালফার জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করলে বা খাবার দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করলে ভিটামিন-ডি নষ্ট হয়ে যায় ফলে হাঁস খাবার হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিন-ডি পায় না।

অভাবজনিত লক্ষণ

- ❖ পায়ের অস্থি নরম, মোটা ও বাঁকা হয়ে যায়, ফলে হাঁস ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। একে **''রিকেট/অস্টিওম্যালেসিয়া''** রোগ বলা হয়।
- ❖ ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে হাড় বাঁকা হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়।
- ❖ ঠোঁট, হাড় ও পায়ের নখ নরম হয়ে যায়, ফলে হাঁস হাঁটুর উপর ভর দিয়ে চলে।
- ❖ দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে ও পাঁজর ফুলে যায়।



চিত্র:- ৩.২৫ ভিটামিন ডি অভাবজনিত লক্ষণ

রোগ নিরূপণ

- লক্ষণ দেখে রোগ নিরূপণ তথা ভিটামিন-ডি এর অভাব বোঝা যায়।
- খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ পরিমাপ করে এবং
- সন্দেহজনক হাঁসকে যদি ভিটামিন-ডি সরবরাহ করে ভালো ফল লাভ করা যায় তাহলে বুঝতে হবে হাঁসগুলো ভিটামিন-ডি এর অভাবে ভুগছিল।

সতর্কতা : অতিরিক্ত মাত্রায় ভিটামিন-ডি খাদ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োগ করলে হাঁসের কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

- খাদ্যে পর্যাপ্ত ভিটামিন-ডি এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন কোম্পানির এ.ডি.ই. দ্রবণ নির্দেশমত খাওয়াতে হবে।
- যেহেতু ভিটামিন-ডি এর সাথে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত তাই একই সাথে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম এর প্রয়োজনীয় ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২০১৫

- খামারে ছোট বাচ্চাগুলোকে সম্ভব হলে দিনের কিছুটা সময় রোদ্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ দিলে এবং সকাল বেলা হাঁসের জন্য সূর্যালোকের ব্যবস্থা করলে ভিটামিন-ডি এর অভাবজনিত রোগের সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।

ভিটামিন ই

ভিটামিন -ই এর অভাবে হাঁসের এনসেফালোমেলাসিয়া, মাসকুলার ডিসট্রোফি, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি রোগ হতে পারে। খাদ্যে অপর্যাপ্ত সেলিনিয়ামের উপস্থিতি, বিভিন্ন উপকরণের সঠিক অনুপাতে মিশ্রণ না করা, তৈল জাতীয় খাদ্যের অক্সিডেশন ইত্যাদির কারণে ভিটামিন-ই এর অভাব হতে পারে।

অভাবজনিত লক্ষণ

- আক্রান্ত হাঁস হাঁটতে পারে না, পা টান করে ছেড়ে দেয়।
- বাচ্চার মাথার বিভিন্ন স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও জায়গাগুলো নরম হয়। এ রোগকে **"এনসেফালোমেলাসিয়া"** বলে।
- বুক ও উরুর মাংস শুকিয়ে যায়, একে **''মাসকুলার ডিসট্রফি''** বলে।
- চামড়ার নিচে পানি জমার কারণে শরীর ফুলে যায়, একে **"অ্যাকজুডেটিভ ডায়াথেসিস"** বলে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

- চিকিৎসার জন্য বাজারে প্রাপ্ত এ.ডি.ই দ্রবণ প্রস্তুতকারকের নির্দেশমতো খাদ্য বা পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধের জন্য সর্বদা খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিনের মাত্রা বজায় রাখতে হবে।
- খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তৈল জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- সংরক্ষিত খাদ্যে এন্টি অক্সিডেন্ট ব্যবহার করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় পরিমাণ খনিজ বিশেষত সেলেনিয়াম খাদ্যে মিশাতে হবে।

ভিটামিন 'কে' (এন্টিহিমোরেজিক ভিটামিন)

এই ভিটামিনটি শরীরে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। এর অভাব হলে ঠোঁট কাটার সময় বা সামান্য আঘাতে অধিক রক্তক্ষরণ হতে পারে। আবার আমাশয় আক্রান্ত হলে পায়খানায় প্রচুর রক্ত দেখা যায়। খাদ্য ও পানিতে যদি সালফার জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হয় তবে এই ভিটামিনটির মেটাবলিজমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করলে অন্ত্রের মধ্যে ভিটামিন-কে উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়াসমূহ মরে যায়, ফলে দীর্ঘদিন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হলে এ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ সৃষ্টি হতে পারে। খাদ্যদ্রব্য অনেক দিন সংরক্ষণ করলেও খাদ্যে উপস্থিত এ ভিটামিনটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

অভাবজনিত লক্ষণ

- এ ভিটামিনের ঘাটতির কারণে শরীরে কোথাও কোথাও কেটে গেলে বা ক্ষত হলে রক্ত পড়া বন্ধ হয় না। ফলে হাঁসের মৃত্যু ঘটে।
- ঠোঁট কাটার পর অধিক সময় ধরে রক্তক্ষরণ হয় ফলে রক্তশূন্যতা সৃষ্টি হয়ে হাঁস মারা যেতে পারে।
- চামড়া ও মাংস পেশিতে রক্তপাত হয়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

- ঠোঁট কাটার কয়েক দিন পূর্ব হতে খাদ্যে ভিটামিন-কে সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- রক্ত আমাশয় এর চিকিৎসা চলাকালেও অতিরিক্ত ভিটামিন-কে সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- সবুজ ঘাস, মাছের গুঁড়া শাকসবজি ইত্যাদি খাওয়ালে ঘাটতি দূর হয়।
- চিকিৎসার জন্য খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন সরবরাহ করতে হবে।
- অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা দেয়ার সময় এবং তারপর কিছুদিন খাদ্যে ভিটামিন-কে সরবরাহ করতে হবে।

ভিটামিন 'বি -১' (থায়ামিন)

পানিতে দ্রবণীয় এ ভিটামিনটির অভাবে খুব তাড়াতাড়ি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। খাদ্যে অধিক পরিমাণে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিন বি-১ বিদ্যমান না থাকলে এর অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায়।

অভাবজনিত লক্ষণ

- অরুচি এবং খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা যায়।
- দৈহিক ওজন হ্রাস পায়।
- পালক উসকো খুসকো হয়ে যায়।
- দুর্বলতা এবং হাঁটতে অনীহা দেখা যায়।
- ঝিমানো ভাব লক্ষ্য করা যায়।
- ঘাড় বাঁকানো বা ঘুরিয়ে উল্টোভাবে রাখা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।
- কখনও কখনও হাঁস ঘাড় পিছনের দিকে বাঁকা করে উর্ধ্বমুখী হয়ে অবস্থান করে। একে **"স্টার গেজিং"** বলে।



চিত্র: ৩.২৬ ভিটামিন-বি-১ এর অভাবজনিত লক্ষণ

রোগ নির্ণয়

- ❖ লক্ষণ অনুযায়ী ভিটামিন বি-১ এর অভাবে ভুগছে বুঝতে পারা।
- ❖ আক্রান্ত হাঁসের খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে আক্রান্ত হাঁসগুলো ভিটামিন বি-১ এর অভাবে ভুগছে কি না।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

- ❖ পানি বা খাবারে ভিটামিন বি-১ সরবরাহ করা। প্রথম কয়েক দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থাৎ ১০-১৫ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি খাবারের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
- ❖ খুব অসুস্থ হাঁসের জন্য আরও বেশি পরিমাণে ভিটামিন বি-১ খাবারে সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- ❖ এর অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিদিন খাবারের সাথে ভিটামিন বি-১ মিশিয়ে দিতে হবে।

ভিটামিন বি-২ (রাইবোফ্লাভিন)

সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি এবং খাবার পানির পিএইচ (অম্লত্ব) ভিটামিন বি-২ কে নষ্ট করে ফেলতে পারে। তাই খাদ্যে এর অভাব দেখা দিতে পারে।

২০২৬

অভাবজনিত লক্ষণ

বাচ্চা অবস্থায় প্রথম কয়েক সপ্তাহে ভিটামিনটির অভাব হলে হাঁসের মধ্যে-

- ❖ দৈহিক দুর্বলতা ও অপর্যাপ্ত বৃদ্ধি হয়।
- ❖ শুকিয়ে যায় এবং স্বাভাবিকভাবে পালক গজায় না।
- ❖ পাতলা পায়খানা হয়।
- ❖ তীব্র আক্রান্ত হাঁসের পা অবশ হয়ে গিয়ে বুকের উপর ভর দিয়ে হাঁটে।
- ❖ প্রায় সময় এ ভিটামিনের অভাবে পায়ের অবশতাজনিত রোগ দেখা যায় যাকে **"কার্ল-টো-প্যারালাইসিস"** বলে। এক্ষেত্রে দুই পা দু' দিকে অর্থাৎ সামনের দিকে এক পা চলে পিছনের দিকে এক পা চলে যায় ফলে পাগুলো অচল হয়ে যায়। তাই তারা হাঁটতে পারে না এবং না খেয়ে মৃত্যুবরণ করে।
- ❖ ব্রিডার হাঁস হলে ডিম হতে বাচ্চা ফোটার হার কমে যায় এবং ডিমের ভিতর বাচ্চা মারা যায়।

রোগ নিরূপণ

রোগের লক্ষণ দেখে ভিটামিন বি-২ সরবরাহ করলে যদি লক্ষণগুলো দ্রুত চলে যায় তবে বুঝতে হবে হাঁসগুলো এ ভিটামিনের অভাবে ভুগছিল।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:

- ❖ খাদ্যের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন বি-২ থাকা দরকার।
- ❖ মাঝে মধ্যে পানিতে অন্যান্য ভিটামিনের সাথে বি-২ সরবরাহ করা প্রয়োজন যাতে এই ভিটামিনের অভাব না হয়।
- ❖ আক্রান্ত হাঁসগুলোকে আলাদাভাবে রেখে ভিটামিন বি-২ খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

ভিটামিন বি-৬ (পাইরিডক্সিন)

খাবারের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থাকলে এবং সে অনুযায়ী ভিটামিন বি-৬ এর স্বল্পতা থাকলে সাধারণত এ ভিটামিনটির অভাবজনিত সমস্যা দেখা যায় । কারণ এটি প্রোটিনের বিপাকে সাহায্য করে ।

অভাবজনিত লক্ষণ

- ❖ দুর্বলতা, খাদ্য গ্রহণে অনীহা বা অরুচি, উসকো খুসকো পালক দেখা যায়।
- ❖ দৈহিক বৃদ্ধি বাধগ্রস্থ বা কম হওয়া।
- ❖ প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- ❖ গুরুতর আক্রান্ত হাঁসগুলো উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটাছুটি করতে থাকে এবং সবশেষে খিঁচুনি দেখা যায় এবং অবশেষে মৃত্যু হয়।

২০২৫

রোগ নির্ণয়

খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ নির্ণয় করে ও রোগের লক্ষণ দেখে প্রাথমিকভাবে ধারণার ভিত্তিতে ভিটামিন বি-৬ সরবরাহ করলে যদি ভালো ফল পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে ঐ ঝাঁকের হাঁসগুলো ভিটামিন বি-৬ এর অভাবে ভুগছিল।

প্রতিকার ও চিকিৎসা

- লক্ষণ প্রকাশ পেলে খাবারের বা পানির সাথে ভিটামিন বি-৬ সরবরাহ করে এ রোগের লক্ষণ প্রশমিত করা যায়।
- নিয়মিত পরিমাণমত ভিটামিন বি-৬ খাবারের সাথে সরবরাহ করলে এর অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায় না।

বায়োটিন

অধিক পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালে পরিপাকতন্ত্রের মধ্যে বায়োটিন সৃষ্টিকারী জীবাণু মরে গিয়ে কিংবা খাদ্যের মধ্যে বায়োটিনের পরিমাণ কম হলে অথবা খাদ্যে বায়োটিন নষ্টকারী কোনো পদার্থের উপস্থিতি থাকলে হাঁসে এটার অভাবজনিত বিভিন্ন উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে। বাচ্চা হাঁসের শরীরের অসাড়তার হাত থেকে রক্ষার জন্য এ ভিটামিনটির বিশেষ প্রয়োজন।

অভাবজনিত লক্ষণ

- পালক ভেঙে ঝুলে পড়ে ও পরে হাড় বাঁকা হয়ে যেতে পারে।
- অনেক সময় চোখের পাতা বুজে থাকে বা চোখ বন্ধ হয়ে যায়।
- বাচ্চা হাঁসের পায়ের নিচে, মুখের কোণায় এবং চোখের পাতায় কড়া পড়ে যেতে পারে।
- ডিমের ভিতরে বাচ্চা মরে যায়।
- ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার হার কমে যায়।

রোগ নির্ণয়

- লক্ষণ দেখে বায়োটিন প্রয়োগের ফলে যদি চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে হাঁসের বায়োটিনের অভাবে ভুগছিল।
- খাদ্যস্থিত বায়োটিনের পরিমাণ এবং রোগের লক্ষণ দেখে সমন্বয় করেও রোগ নির্ণয় করা যায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

- খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ বায়োটিন মিশাতে হবে।
- রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে পানিতে অতিরিক্ত বায়োটিন মিশাতে হবে।
- খাদ্য বা পানিতে অত্যধিক অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার পরিহার করতে হবে।
- খাদ্যস্থিত বায়োটিনের পরিমাণ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, যাতে বায়োটিনের অভাব না হয়।

কলিন

হাঁসের শরীরে বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপে কলিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শারীরিক অসাড়তা দূর ও শরীরের বৃদ্ধির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি দেহের বিভিন্ন টিস্যু বা কলার গঠনে এবং স্নায়ুতন্ত্র সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হাঁসের খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কলিন সরবরাহ করা বাঞ্ছনীয়।

অভাবজনিত লক্ষণ

- ❖ পায়ের হাড় নরম ও বাঁকা হয়ে হাঁস অসাড় হয়ে যায়।
- ❖ দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- ❖ ব্রয়লার ব্রিডার হাঁসের কলিজায় অতিরিক্ত চর্বি ও রক্তক্ষরণজনিত লক্ষণ দেখা দেয়।
- ❖ ব্রয়লার ব্রিডার হাঁসের মৃত্যুর হার বেড়ে যায়, পেটে অতিরিক্ত চর্বি জমে যায় ফলে ডিম পাড়াও কমে যায়।

রোগ নির্ণয়

লক্ষণ দেখে এবং পোস্টমর্টেমের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। এছাড়াও খাদ্যস্থিত কলিন বৃদ্ধি করে যদি ফল পাওয়া যায় তবে ধরতে হবে কলিনের অভাব ছিল।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

খাবারের তালিকায় যথেষ্ট পরিমাণ সয়াবিন মিল, গম ভাঙা, ফিস মিল ইত্যাদি থাকায় হাঁসে কলিনের অভাব সাধারণত হয় না। কারণ সয়াবিন মিল ও ফিসমিলে প্রচুর পরিমাণে কলিন থাকে। আবার গম ভাঙার মধ্যে বিটেইন নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে যা কলিনের মতো মিথাইল দানকারী হিসেবে কাজ করে কলিনের অভাব পূরণ করে। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, প্রায়ই দেখা যায় হাঁসে কলিনের অভাব হয়। তাই বাজারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যে কলিন বা কলিন ক্লোরাইড পাওয়া যায়, তা প্রয়োজন মত খাবারে মিশিয়ে দিতে হবে। তবেই কলিনের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

বাজারে প্রাপ্ত কলিন প্রায় সময়ই কলিন ক্লোরাইড নামে বিভিন্ন শতাংশের (%) কোলিন ক্লোরাইড হিসেবে পাওয়া যায়। যেমন : ক্লোরাইড ৫০% বা কলিন ক্লোরাইড ৪০% ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, কোলিন ক্লোরাইডের মধ্যে প্রকৃত কলিনের পরিমাণ ৮৬.৭৯%। তাই উক্ত কলিন ক্লোরাইড খাবারে মিশানোর সময় প্রকৃত কলিনের পরিমাণ যথাযথভাবে নির্ণয় করে প্রয়োজন অনুযায়ী কলিন ক্লোরাইড মিশাতে হবে।

ভিটামিন বি-১২ (সায়ানো-কোবালামিন)

শরীরের কোষের নিউক্লিক এসিড তৈরিতে, শর্করা ও চর্বির বিপাকীয় প্রকিয়ায় ভিটামিন বি-১২ সাহায্য করে। তন্ত্রের বিভিন্ন জীবাণু এই ভিটামিনটি তৈরি করে বিধায় এই ভিটামিনটির অভাবজনিত রোগ খুব কম দেখা দেয় এবং খাদ্যে এর প্রয়োজন অত্যন্ত নগণ্য। পাখির বিষ্ঠার সাথে যে জীবাণু বের হয় এবং লিটারে পড়ে সেগুলোও এই ভিটামিনটি তৈরি করতে পারে। ফলে লিটারে পালিত মোরগ-মুরগির এই ভিটামিনের অভাব

হওয়ার সম্ভাবনা আরও কম। যদি হাঁসকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত অত্যধিক পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো হয়, তবে এই ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

অভাবজনিত লক্ষণ

- দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- মৃত্যুর হার বেড়ে যায় এবং ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার হার কমে যায়।
- ডিমের মধ্যে বাচ্চার মৃত্যুও ঘটতে পারে।

রোগ নির্ণয়

অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের ইতিহাস, লক্ষণ ইত্যাদি দেখে ভিটামিন বি-১২ দিয়ে চিকিৎসা দিলে যদি ভালো ফল পাওয়া যায়, তবে বুঝতে হবে হাঁসে ভিটামিন বি-১২ এর অভাব ছিল।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

- লক্ষণ দেখা দিলে পানি বা খাবারের সাথে ভিটামিন বি-১২ সরবরাহ করতে হবে।
- সুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে পানির সাথে ভিটামিন সরবরাহ করতে হবে।

ভিটামিন সি

স্ট্রেস বা পীড়ন প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর উপাদান হিসেবে ভিটামিন-সি ব্যবহার হয়ে থাকে। হাঁসে ভিটামিন সি যথেষ্ট পরিমাণে নিজেরাই উৎপাদন করতে পারে। দৈহিক বৃদ্ধি, বীর্য উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন রকম বিষক্রিয়া বিশেষত কিছু খনিজ লবণের বিষক্রিয়ার হাত থেকে হাঁসকে রক্ষা করার ক্ষমতা ভিটামিন-সি এর রয়েছে। খাদ্যে ভিটামিন-সি এর অভাব থাকলে বা হাঁস অত্যধিক গরম আবহাওয়ায় থাকলে বা পীড়ণ (স্ট্রেস) সৃষ্টি হলে হাঁসের ভিটামিন-সি এর অভাব দেখা দিতে পারে।

অভাবজনিত লক্ষণ

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- দৈহিক বৃদ্ধির হার কমে যায়।
- খাদ্য হজম কম হয়।
- পীড়নের মধ্যে পড়লে সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে অর্থাৎ পীড়ণ সহ্য করার ক্ষমতা কমে যায়।
- প্রজনন হাঁসার প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

- খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-সি মেশাতে হবে।
- হাঁসের ঘরের মধ্যে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- পীড়ন হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে পানির সাথে অতিরিক্ত ভিটামিন-সি মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

- ❖ ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে ও পরে কয়েকদিন ভিটামিন-সি সরবরাহ করতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত রোগের লক্ষণ কীভাবে বোঝা যায়?
- ভিটামিন-ডি এর অভাবজনিত রোগের লক্ষণ লেখো।
- ভিটামিন বি-১ এর অভাবজনিত রোগের লক্ষণ লেখো।
- ভিটামিন বি-৬ এর অভাবজনিত রোগের লক্ষণ লেখো।

খ) খনিজ পদার্থের অভাবজনিত রোগ (ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস)

খনিজ পদার্থের কাজ

- ❖ হাঁসের দৈহিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য রক্ষা ও প্রজননের জন্য খনিজ পদার্থ অত্যাবশ্যক।
- ❖ হাঁসের দেহের অস্থি গঠন, ডিমের খোসা তৈরিতে খনিজ পদার্থ অত্যাবশ্যক।
- ❖ দেহের অম্লত্ব-ক্ষারত্ব সমতা রক্ষা করে।
- ❖ খনিজ শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাদ্যের বিপাকে সাহায্যে করে।

অভাবজনিত লক্ষণ

- ❖ আক্রান্ত হাঁসের ঠোঁট নরম ও বাঁকা হয়।
- ❖ অস্থির গঠন ঠিকমতো হয় না।
- ❖ রক্ত জমাট বাঁধে না।
- ❖ রিকেট রোগ ও কেজ লেয়ার ফ্যাটিগ রোগ হয়।
- ❖ বাচ্চা ফোটার হার কমে যায়।




চিত্রঃ ৩.২৭ ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

- মাছের গুঁড়া, ঝিনুক, হাড়, দানা শস্য, পালং শাক ইত্যাদি হাঁসের খাদ্যে সরবরাহ করলে এই রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়।
- হাঁসের খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হবে- বাচ্চা হাঁসে ২.২ : ১।
- হাঁসের খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হবে- বাড়ন্ত হাঁসে ২.৫ : ১।
- হাঁসের খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হবে- ডিমপাড়া হাঁসে ৯ : ১।

সোডিয়াম

সোডিয়ামের কাজ

- দেহের অম্ল-ক্ষারত্ব সমতা রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত জরুরি।
- অস্থি গঠন করে।

অভাবজনিত লক্ষণ

- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না।
- হাড় নরম হয়।
- রক্ত পাতলা হয়।
- ডি-হাইড্রেশন দেখা দেয় ও মৃত্যুও ঘটে।

প্রতিকার ও চিকিৎসা : খাদ্যে সাধারণ লবণ সরবরাহ করে এর অভাব দূর করা যায়।

জিংক

জিংকের কাজ

- হাঁসের দৈহিক বৃদ্ধি, পালক গজানো ও ডিম উৎপাদনের জন্য জিংক প্রয়োজন।
- অস্থির গঠনে জিংক প্রয়োজন।

অভাবজনিত লক্ষণ

- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না।
- পালক কম গজায় ও পায়ের চামড়া উঠে যায়।
- পায়ের হাড় খাটো ও মোটা হয়।
- হাঁস ঠোকরা ঠুকরি করে।

প্রতিকার ও চিকিৎসা : হাঁসের খাদ্যে জিংকের বা জিংক সমৃদ্ধ উপকরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে ।

সেলেনিয়াম

সেলেনিয়ামের কাজ

সেলেনিয়াম হচ্ছে গ্লুটাথায়োন পারোক্সিডেজ (Glutathion Peroxidase) নামক এনজাইমের অংশ যা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে।

অভাবজনিত লক্ষণ

- ফুটানোর ডিম বসানোর ৪র্থ দিনে ভ্রুণের মৃত্যু হয়।
- চামড়ার নিচে পানি জমে।
- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না।
- রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

প্রতিকার ও চিকিৎসা

ছোলা জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে বা খাদ্যে সেলেনিয়াম যুক্ত করলে এর অভাব দূর হয়।

লৌহ ও কপার

অভাবজনিত লক্ষণ

- রক্তশূণ্যতা বা অ্যানিমিয়া রোগ হয়।

- ❖ লাল পালক এর রং ফ্যাকাশে হয়।
- ❖ স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

প্রতিকার ও চিকিৎসা : শাকসবজি, ঘাস, মাছের গুঁড়া ইত্যাদি খাওয়াতে হবে। খাদ্যে ফেরাস সালফেট ও কপার সালফেট সংযোজন করতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- হাঁসের শরীরে খনিজ পদার্থের কাজ লেখো।
- ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস এর অভাবজনিত রোগের লক্ষণ লেখো।
- সেলেনিয়াম এর অভাবজনিত রোগের লক্ষণ লেখো।

৩.৪ হাঁসের প্রতিরোধক টিকাদান কর্মসূচি

টিকাবীজ হচ্ছে রোগের প্রতিরোধক যা রোগের জীবাণু বা জীবাণুর অ্যান্টিজেনিক উপকরণ দ্বারা তৈরী করা হয়। হাঁসের দেহের ভেতর রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য টিকাবীজ প্রয়োগ করতে হয়। টিকাবীজ প্রয়োগের ফলে দেহের ভেতর রক্ত বা রক্তরসে এক প্রকার ইমিউনোগ্লোবিউলিন নামক আমিষ পদার্থ তৈরী হয়। যাকে এন্টিবডি বলা হয়। এন্টিবডিই হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ পদার্থ। এজন্য কৃত্রিম উপায়ে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যাবধানে টিকা প্রদানের যে সিডিউল তৈরী করা হয় তাই টিকাদান কর্মসূচী।

রোগের নাম	টিকার নাম	প্রাপ্তিস্থান	প্রয়োগের সময়	প্রয়োগের পদ্ধতি
ডাক প্লেগ	ডাক প্লেগ টিকা	দেশের সকল পশু হাসপাতাল	১ম মাত্রা ২১-২৮ দিন বয়সে, দ্বিতীয় মাত্রা (বুস্টার ডোজ) ১ম মাত্রার ১৫ দিন পর, পরবর্তীতে প্রতি ৪-৫ মাস পরপর একবার।	১ মিলি করে বুকের মাংসে অথবা বিধি মোতাবেক প্রয়োগ করতে হবে।
ডাক কলেরা	ডাক কলেরা টিকা	দেশের সকল পশু হাসপাতাল	১ম মাত্রা ৪৫-৬০ দিন বয়সে, দ্বিতীয় মাত্রা (বুস্টার ডোজ) ১ম মাত্রার ১৫ দিন পর, পরবর্তীতে প্রতি ৪-৫ মাস পরপর একবার।	চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হবে।

বি. দ্র. প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুতকারী কোম্পানির নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োগ করা উচিত।



চিত্র: ৩.২৮ ডাক প্লেগ টিকা



চিত্র: ৩.২৯ ডাক কলেরা টিকা

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- হাঁসের প্লেগ রোগের টিকাদান পদ্ধতি লেখো।
- হাঁসের কলেরা রোগের টিকাদান পদ্ধতি লেখো।
- হাঁসের টিকাবীজগুলো কোথায় পাওয়া যায়?

৩.৫ জৈব নিরাপত্তা (বায়োসিকিউরিটি)

খামারকে রোগমুক্ত রাখতে ও কাঙ্খিত উৎপাদন পেতে হলে বায়োসিকিউরিটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বায়োসিকিউরিটি বজায় রাখার কিছু পদক্ষেপ নিম্নে আলোচনা করা হলো- ২০২৫

- শুকনা ও খোলামেলা জায়গায় যা জলাশয়, বাজার ও বনজঙ্গল থেকে দূরে, স্বাস্থ্যসম্মত ঘর তৈরি করতে হবে যেন হাঁস পর্যাপ্ত আলো বাতাস পায়। সেডের নিকটে বড় গাছ বা ঝোঁপঝাড় রাখা যাবে না।
- খামারে নতুন বাচ্চা উঠানোর আগে খামার সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- সংখ্যানুপাতে ঘরে খাদ্যের পাত্র ও পানি পাত্র দিতে হবে।
- সালমোনেলা ও মাইকোপ্লাজমা রোগ মুক্ত হ্যাচারি থেকে সুস্থ সবল বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে।
- ভালো গুণগতমানসম্পন্ন খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- পরিচর্যাকারী ছাড়া খামারে মানুষের অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতিবার খামারে প্রবেশ করা ও খামার হতে বের হওয়ার সময় হাত ও পা অবশ্যই জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- খামারে ব্যবহারের জন্য আলাদাভাবে পোশাক ও জুতার ব্যবস্থা করতে হবে।
- খামারে কোনো হাঁস অসুস্থ হলে দ্রুত পৃথক করতে হবে এবং মারা গেলে সাথে সাথে সরিয়ে নিয়ে ২ হাত গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। অসুস্থ হাঁস বাজারে বিক্রি করা যাবে না।
- খামারে যাতে বন্য পাখি, কুকুর, শিয়াল ও ইঁদুর জাতীয় প্রাণি প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ এদের মাধ্যমে রাণীক্ষেত, মাইকোপ্লাজমা ও সালমোনেলা রোগ ছড়াতে পারে।
- খামারের চারদিকে বেড়া দেয়া যাতে বন্য প্রাণি, কুকুর, বিড়াল, দেশি হাঁস বা মুরগি ঢুকতে না পারে। এছাড়া প্রবেশ পথে একটি **"প্রবেশ নিষেধ"** সাইনবোর্ড টানানো।
- খামারের নিজস্ব পরিবহন না থাকলে বাজারের পরিবহনকে খামারের বেড়ার মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। যানবাহানের চালক বা কর্মীকে খাদ্য বা অন্যান্য দ্রব্য নিয়ে খামারে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। খামারের কর্মী দ্বারা এই দ্রব্যগুলো নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানরত পরিবহন থেকে আনতে হবে। তবে প্রয়োজনে পরিবহনের গায়ে ভালোভাবে জীবাণুনাশক স্প্রে করে ১০০ মিনিট রাখার পর ভিতরে ঢুকতে দেওয়া যাবে।
- সপ্তাহে একদিন খামারে মাচা, বেড়া ও আশপাশ জীবাণুনাশক দ্বারা স্প্রে করতে হবে।
- খামারের যন্ত্রপাতি, ডিমের ট্রে ইত্যাদি ভালোভাবে গরম সাবান-পানি দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে তারপর জীবাণুনাশকে চুবিয়ে বা স্প্রে করে রোদে শুকিয়ে খামারে প্রবেশ করাতে হবে।
- বাজার থেকে খামারি ফেরার পর জুতা ভালোভাবে সাবান দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে। কাপড় ধুয়ে নিজে গোসল করতে হবে।
- কখনই ডিম/হাঁস বহনকারিকে খামারে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।
- অবিক্রিত হাঁস ও ডিম বাজার হতে খামারে ফিরিয়ে আনা যাবে না।
- বর্জ্য পদার্থ, বিষ্ঠা, লিটার নিয়মিত পরিষ্কারসহ হাঁস-মুরগির ঘরের ভেতরের পরিবেশ অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত হবে।

- ❖ প্রতি ব্যাচ সম্পন্ন করার কমপক্ষে ১৫ দিন পর বাচ্চা উঠানো যাবে। বাচ্চা উঠানোর পূর্বে মাচা, বেড়া, লিটার, খাদ্য পাত্র, পানি পাত্র, দেয়াল ও আশপাশ ভালোভাবে জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। পুরো ঘর ফিউমিগেশন করতে হবে।
- ❖ ব্যবহৃত খাদ্যপাত্র, পানি পাত্র ও লিটার ৩ দিন পরপর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- ❖ পুরাতন হাঁসের ফ্লকে নতুন হাঁস ঢোকানো যাবে না।
- ❖ খামারের বর্জ্য দূরে কোথাও মাটি চাপা দেয়া বা পঁচানো বা কম্পোস্ট তৈরি করা যেতে পারে বা পুড়িয়ে ফেলা যেতে পারে।
- ❖ বিভিন্ন প্রজাতির এবং বিভিন্ন বয়সের হাঁসকে আলাদাভাবে পালন করতে হবে।
- ❖ পারিবারিক খামারের পরিচর্যাকারিরা হাঁসের ঘর পরিষ্কার ও যত্ন নেয়ার পর হাত-পা, স্যান্ডেল-জুতা ভালোভাবে সাবান দিয়ে ধুতে হবে।
- ❖ গৃহপালিত হাঁসকে মুরগি, কবুতর ও বন্য প্রাণির সাথে মিশতে দেয়া যাবে না।
- ❖ খামারে কাজ করার সময় নাকে মাস্ক পড়তে হবে। কারণ হাঁস বার্ড ফ্লু ভাইরাসের বাহক হিসাবে কাজ করে।
- ❖ পারিবারিক ছোট খামারের বিষ্ঠা ও অন্যান্য আবর্জনা প্রতিদিন পরিষ্কার করে ঢাকনাযুক্ত গর্তে ফেলতে হবে।
- ❖ বাড়ির শিশুদের অসুস্থ ও মৃত হাঁস হতে দূরে রাখতে হবে।
- ❖ খামার থেকে ডিম তোলা ও হাঁস ধরার পর শিশুদের সাবান দিয়ে হাত ধোয়া নিশ্চিত করতে হবে।
- ❖ শিশুদের হাঁস ও পোষা পাখি থেকে দূরে রাখতে হবে এবং খেলতে দেয়া যাবে না।
- ❖ অসুস্থ হাঁস জবাই করে খাবারের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- ❖ অসুস্থ হাঁস বাজার থেকে কেনা যাবে না।
- ❖ অতিথি পাখি বার্ড ফ্লু ভাইরাস বহন করে বিধায় যেখানে অতিথি পাখি চরে সেখানে পোষা হাঁস চরতে দেওয়া যাবে না।
- ❖ বন্য পাখি বা অতিথি পাখি শিকার করা বা কেনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

অনুসন্ধানমূলক কাজ

তোমার প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি যে কোন একটি হাঁসের খামার পরিদর্শন করো। খামারে হাঁসের যে সমস্ত রোগ পরিলক্ষিত হলো তার লক্ষণসহ একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

খামারের নাম	
ঠিকানা	
রোগের নাম	রোগের লক্ষণ
১. ডাক প্লেগ	১. ২. ৩.

	৪. ৫.
২. ডাক কলেরা	১. ২. ৩. ৪. ৫.
৩. বটুলিজিম	১. ২. ৩. ৪. ৫.
৪. কলিবেসিলোসিস	১. ২. ৩. ৪. ৫.
৫. ডাক হেপাটাইটিস	১. ২. ৩. ৪. ৫.
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
শ্রেণি শিক্ষকের নাম	
বিঃদ্রঃ ছকটি পূরণ করে তোমার শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দাও	

জব ০৭: ডাক প্লেগ রোগের টিকাদান পদ্ধতি

পারদর্শিতার মানদণ্ড

১) ডাক প্লেগ রোগের টিকা সনাক্ত করা

২) সঠিক পদ্ধতিতে টিকাবীজ পাতিত পানির সঙ্গে মিশ্রিত করা

৩) ডাক প্লেগ রোগের টিকা প্রদান করা

৪) টিকা প্রদান করে খামার রোগমুক্ত করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	১টি
২	রাবার হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
৩	সেফটি গগলস	মাঝারি মাপের	১টি
৪	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৫	হেড কভার	মাঝারি মাপের	১টি
৬	গামবুট	শিক্ষার্থীর পায়ের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া



চিত্র: অ্যাপ্রন



চিত্র: রাবার হ্যান্ড গ্লোভস



চিত্র: সেফটি গগলস



চিত্র: মাস্ক



চিত্র: হেড কভার



চিত্র: গামবুট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অটো ভেক্সিনেটর	উন্নত মানের	১টি
২	সিরিঞ্জ	উন্নত মানের	১টি
৩	নিডিল	উন্নত মানের	১টি
৪	অটোক্লেভ	উন্নত মানের	১টি
৫	বিকার	উন্নত মানের	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials)

ক্রম	কাঁচামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	হাঁসের বাচ্চা	২১-২৮ দিন বয়সের	১০টি
২	ডাকপ্লেগ টিকাবীজ	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	১টি
৩	সিরিঞ্জ	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	১টি
৪	নিডিল	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	২০টি
৫	মগ	উন্নত মানের	১টি
৬	বালতি	উন্নত মানের	১টি
৬	পাতিত পানি	উন্নত মানের	১ বোতল



চিত্র: হাঁসের বাচ্চা



চিত্র: টিকাবীজ



চিত্র: সিরিঞ্জ নিডল



চিত্র: পাতিত পানি

কাজের ধারা

১. টিকা প্রদানের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করে নাও।

২. বিশ্বস্ত উৎস হতে টিকাবীজ সংগ্রহ কর এক্ষেত্রে ওয়ার্কশপের রেফ্রিজারেটরে রক্ষিত টিকাবীজ সংগ্রহ করো।

৩. সূচী মোতাবেক সুস্থ হাঁসের শেডে যাও।

৪. টিকা প্রদানের সময় হলে দিনের ঠান্ডা অংশে (সকাল বা সন্ধ্যা) ছায়াযুক্ত স্থানে টিকাবীজ প্রস্তুতকারীর নির্দেশ মোতাবেক ডায়লুয়েন্ট বা পাতিত পানির (এক্ষেত্রে ভায়ালের টিকা বীজ ১০০ সিসি পানির সাথে মিশাও) সাথে মিশ্রিত করো।

ক) ভায়ালটি (ধূসর বর্ণের ট্যাবলেট আকারে ১০০ মাত্রার টিকাবীজ) সংগ্রহ করো।

খ) ভায়ালে রক্ষিত টিকাবীজ ১০০ সিসি পাতিত পানিতে মিশ্রিত করো।

গ) ১ সিসি করে বুকের মাংসে পুশ করো।

ঘ) ১মাস বয়সে প্রথমবার এবং প্রতি ৬মাস অন্তর পরবর্তী ডোজ প্রদান করো।

৫. এরপর হাঁসকে সঠিকভাবে ধরে আয়ত্তে আন, নিম্নলিখিতভাবে টিকা প্রদান করো।



চিত্র: ডাক প্লেগ রোগের টিকা প্রদান

৬. টিকাদানকৃত হাঁসকে পৃথক করে রাখো।
৭. গরমকালে ১ঘন্টা ও শীতকালে ২ঘন্টার মধ্যে টিকাদান কার্যক্রম শেষ করো।
৮. অবশিষ্ট টিকা ও ভায়াল মাটিতে পুতে ফেলো।
৯. পুনঃ ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করো।

বিঃ দ্রঃ বাজারে বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক বাজারজাতকৃত টিকাবীজ তাদের সরবরাহকৃত ডায়লুয়েন্টের সাথে মিশিয়ে কোম্পানির নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োগ করতে হয়।

সতর্কতা
১) অসুস্থ হাঁসকে টিকা দেয়া যাবে না।
২) টিকা প্রদান ও মিশ্রণের সময় অবশ্যই নির্ধারিত মাত্রা মেনে চলতে হবে।
৩) অবশিষ্ট টিকা ও ভায়াল মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

জব ০৮: ডাক কলেরা রোগের টিকাদান পদ্ধতি

পারদর্শিতার মানদণ্ড
১) ডাক কলেরা রোগের টিকা সনাক্ত করা
২) সঠিক পদ্ধতিতে টিকাবীজ পাতিত পানির সঙ্গে মিশ্রিত করা
৩) ডাক কলেরা রোগের টিকা প্রদান করা
৪) টিকা প্রদান করে খামার রোগমুক্ত করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	১টি
২	রাবার হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
৩	সেফটি গগলস	মাঝারি মাপের	১টি
৪	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৫	হেড কভার	মাঝারি মাপের	১টি
৬	গামবুট	শিক্ষার্থীর পায়ের মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া



চিত্র: অ্যাপ্রন



চিত্র: রাবার হ্যান্ড গ্লোভস



চিত্র: সেফটি গগলস



চিত্র: মাস্ক



চিত্র: হেড কভার



চিত্র: গামবুট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অটো ভ্যাকসিনেটর	উন্নত মানের	১টি
২	সিরিঞ্জ	উন্নত মানের	১টি
৩	নিডিল	উন্নত মানের	১টি
৪	অটোক্লেভ	উন্নত মানের	১টি
৫	বিকার	উন্নত মানের	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials)

ক্রম	কাঁচামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	হাঁসের বাচ্চা	২১-২৮ দিন বয়সের	১০টি
২	ডাক কলেরা টিকাবীজ	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	১টি
৩	সিরিঞ্জ	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	১টি
৪	নিডিল	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	২০টি
৫	মগ	উন্নত মানের	১টি
৬	বালতি	উন্নত মানের	১টি
৬	পাতিত পানি	উন্নত মানের	১ বোতল



চিত্র: হাঁসের বাচ্চা



চিত্র: টিকাবীজ



চিত্র: সিরিঞ্জ নিডিল



চিত্র: পাতিত পানি

কাজের ধারা

১. টিকা প্রদানের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করো।

২. বিশ্বস্ত উৎস হতে টিকাবীজ সংগ্রহ করো, এক্ষেত্রে ওয়ার্কশপের রেফিজারেটরে রক্ষিত টিকাবীজ সংগ্রহ করো।

৩. সূচী মোতাবেক সুস্থ হাঁসের শেডে যাও।

৪. টিকা প্রদানের সময় হলে দিনের ঠান্ডা অংশে (সকাল বা সন্ধ্যা) ছায়াযুক্ত স্থানে টিকাবীজ প্রস্তুতকারির নির্দেশ মোতাবেক ডায়লুয়েন্ট বা পাতিত পানির (এক্ষেত্রে ভায়ালের টিকাবীজ ১০০ সিসি পানির) সাথে মিশ্রিত করো।

ক) টিকাবীজ (কাঁচের বোতলে গুলানো অবস্থায় ১০০ মাত্রার টিকাবীজ) সংগ্রহ করো।
খ) এ ভ্যাকসিন সিরিঞ্জের সাহায্যে ১ সি সি করে চামড়ার নীচে ইনজেকশন আকারে প্রয়োগ করো।
গ) ৪৫-৬০ দিন বয়সে প্রথমবার তারপর প্রতি ৬ মাস পর পর টিকা প্রয়োগ করো।

৫. এরপর হাঁসকে সঠিক ভাবে ধরে আয়ত্তে আন এবং নিম্নলিখিতভাবে টিকা প্রদান করো।



চিত্র: ডাক কলেরা রোগের টিকা

৬. টিকাদানকৃত হাঁসকে পৃথক করে রাখো।
৭. গরমকালে ১ঘন্টা ও শীতকালে ২ঘন্টার মধ্যে টিকাদান কার্যক্রম শেষ করো।
৮. অবশিষ্ট টিকা ও ভায়াল মাটিতে পুঁতে ফেলো।
৯. পুনঃ ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করো।

বিঃ দ্রঃ বাজারে বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক বাজারজাতকৃত টিকাবীজ তাদের সরবরাহকৃত ডায়লুয়েন্টের সাথে মিশিয়ে কোম্পানির নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োগ করতে হয়।

সতর্কতা
১) অসুস্থ হাঁসকে টিকা দেয়া যাবে না।
২) টিকা প্রদান ও মিশ্রণের সময় অবশ্যই নির্ধারিত মাত্রা মেনে চলতে হবে।
৩) অবশিষ্ট টিকা ও ভায়াল মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন
১. রোগ কাকে বলে?
২. সংক্রামক রোগ কাকে বলে?
৩. হাঁসের ব্যাকটেরিয়াজনিত দু'টি রোগের নাম লেখো।
৪. হাঁসের ভাইরাসজনিত রোগের নাম লেখো।
৫. ডাক কলেরা রোগের জীবাণুর নাম লেখো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন
১. একটি সুস্থ হাঁসের বৈশিষ্ট্য লেখো।
২. হাঁসকে রোগমুক্ত রাখার উপায়গুলো লেখো।
৩. ডাক প্লেগ রোগের লক্ষণসমূহ লেখো।
৪. ওম্ফালাইটিস রোগের লক্ষণসমূহ লেখো।
৫. ভিটামিন- এ এর অভাবজনিত লক্ষণ লেখ।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন
১. ডাক প্লেগ রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার লেখো।
২. ডাক কলেরা রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা লেখো।
৩. টিকা ব্যবহারের সাধারণ নিয়মাবলি লেখো।
৪. টিকার কার্যকারিতা নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ লেখো।
৫. ডাক প্লেগ ও ডাক কলেরা রোগের টিকা প্রদানের পদ্ধতি বর্ণনা করো।

সমাপ্ত

২০১৬

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-২

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি